২য় বর্ষ | ২য় সংখ্যা
নভেম্বর, ২০২৩ খৃ.

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে ...

আল কুদস সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম- এর মুখপত্র

২য় বর্ষ। ২য় সংখ্যা। নভেম্বর, ২০২৩ খৃ.

নবীন কণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে ...

ব্যবস্থাপনায়

মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের, কবি রাশেদ নাইব
আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী ,মুফতী ইমদাদুল্লাহ
মুহা. সায়েম আহমাদ , শেখ মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ
মুফতী ওয়ালিউল্লাহ তাহসিন

ফিলিস্তিনের এই করুণ সংকটময় মুহূর্তে আমরা যদিও সশরীরে তাদের জন্য কিছু করতে পারছি না। কিন্তু আমাদের করার আছে অনেক কিছু। প্রথমত আমরা বুক ভাসিয়ে আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য দোয়া করতে পারি। আর্থিক সহায়তা পাঠাতে পারি। তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে পারি। ইসরাইলকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত তাদের পণ্যাসব বয়কট করতে পারি। এসব কিছুর পাশাপাশি আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করতে পারি। আর তা হলো, ফিলিস্তিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি। আল আকসার স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনা উম্মাহর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারি।

সেই ধারাবাহিকতায় 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম'-এর মুখপত্র 'নবীনকণ্ঠ' এবার আয়োজন করেছে আল-কুদস সংখ্যা। আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহকে কবুল ফরমান।

প্রতিষ্ঠা
ফেব্রুয়ারী , ২০২২ খ্রি. / শাবান , ১৪৪৪ হি.

উপদেষ্টা
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

তত্ত্বাবধায়ক
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী

মুহা. হাছিবুর রহমান

সম্পাদক
উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পদক
বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক
কাজী মা'রুফ

শামসুল আরেফীন

যোগাযোগ

অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর,সাভার, ঢাকা । সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

২য় বর্ষ । ২য় সংখ্যা

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে 'নবীনকণ্ঠ' এবারের আয়োজন
আল-কুদস
সংখ্যায় যারা লিখেছেন;

লেখক সূচী

এ সংখ্যায় যারা লিখেছেন

প্রবন্ধ

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
মূল: এনায়েতুল্লাহ ওয়ানি নদভী
(অনুবাদ ও সংযোজন: মুফতী ইমদাদুল্লাহ)
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী
আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী
মুহা. হাছিবুর রহমান
আলী ওসমান শেফায়েত
মুফতী যুবায়ের মাহমুদ রহমানী
আব্দুল কাদির ফারুক
শেখ মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ
ইমরান হুসাইন
মুফতী আইয়ুব নাদীম

মতামত

মুফতী সাইফুল্লাহ বিন কাসিম
মুহা. সায়েম আহমাদ
মাও. হাবীব উল্লাহ
আনিসুর রহমান আফিফি
জাবের মাহমুদ
জুবায়ের আহমেদ
আব্দুর রশীদ
মুহাম্মাদ হাসনাইন

ছড়া/কবিতা

কাজী মারুফ, সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম
মুহাম্মাদ আলম জাহাঙ্গীর, নাজমুল হক
বাসুদেব সরকার, তাসনিম হোসেন
শামসুল আরেফীন, মুহাম্মদ মুকুল মিয়া
ইবনে আলাউদ্দিন, মুহা. মাহাদী হাসান
রবিউল হাসান আরিফ, মুহা. আব্দুল্লাহ
মুহা. আব্দুল হাকিম, উম্মে আফিয়া
আয়মান আরশাদ, মুহা. নূর ইসলাম
তানভীর বিন ইসলাম,উম্মে হানি সিফা,
জাহিদ হাসান

মুক্তগদ্য

তানবিরুল হক আবিদ
ফারিহা জান্নাত
তাওসীফ আহমাদ
হুসাইন আহমদ
তাশরীফ আহমদ
ইলিয়াস মুহা. সোহাগ

গল্প

এস. আজম রোকন
রাশেদ নাইব
সাঈফ আশরাফ
রশীদ আহমেদ

রোযনামচা

মাহবুবা সিদ্দিকা
আমেনা আক্তার
তাওহীদ ইসলাম

ভ্রমণকাহিনি

এম. এ. রাজ্জাক
মঞ্জুরুল হক বাশার
রবিউল হাসান আরিফ

নবীন কণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে ...

সম্পাদকীয়

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি অবারিত রহমতে সিক্ত করেছেন আমাদের এবং সদা বর্ষণ করে চলেছেন অফুরন্ত করুণার ঝর্ণাধারা।

পর কথা হলো, একঝাঁক স্বপ্নবাজ তরুণের হাতে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম'-এর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। এতে আমিও আবেগাপ্লুত। কেননা, আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম (BNLF) চায়– বর্তমান অবহেলিত, অনলাইন-গেইম-মোবাইলে আসক্ত ও বিক্ষিপ্ত তরুণসমাজ লেখালেখির ময়দানে ফিরে আসুক। নিজেদের সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশ করুক। সত্যের আলো লেখার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিক। বাতিলের বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধে শরিক হোক।

সেই স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম আয়োজন করেছে একটি সাহিত্য ম্যাগাজিন 'নবীনকণ্ঠ'। যা প্রকৃতপক্ষে নবীনদের কণ্ঠস্বর হবে। এই পত্রিকার মাধ্যমে নবীনরা সত্যের আওয়াজ তুলবে, ইনশাআল্লাহ। সেই আশা ও প্রত্যাশার জায়গা থেকে নবীনকণ্ঠ পরিবার এবার আয়োজন করেছে আল-কুদস সংখ্যা।

এই সংখ্যা নির্ধারণের অন্যতম কারণ হলো, বিশ্বের সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত জেলখানা বলা হয় ফিলিস্তিনকে। অভিশপ্ত ইহুদি ইসরাইল জাতির হিংস্র থাবায় ফিলিস্তিন ও গাযাসহ বিভিন্ন শহর আজ মৃতপ্রায়। বহু আগ থেকে চলে আসা এই যুদ্ধে সর্বোচ্চ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এই অক্টোবর মাসে। নরপিশাচ জালেমের থাবায় মহিলা-শিশু, আবাল-বৃদ্ধ কেউই রেহাই পাচ্ছে না। আকাশপথ, নৌপথ ও স্থলপথে বোমাবর্ষণ আজও বহাল রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন না মানা এই লা'নতি নেতানিয়াহু যেকোনো পন্থা অবলম্বন করছে, পবিত্র ভূমির এই মুসলিম জাতিকে নিধন করার জন্য। জালেমের হিংস্র থাবার ভয়ে সাধারণ মানুষ হসপিটালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েও রেহাই পাচ্ছে না। মনুষত্বহীন নির্দয় এই সৈন্যদের হাত থেকে স্থানীয় ধর্মীয় উপাসনাগুলোও রক্ষা পাচ্ছে না। শরণার্থী হিসেবে আশা এই অভিশপ্ত ইহুদি জাতি ফিলিস্তিনের সেই নাগরিকদের হত্যা করছে, যারা তাদেরকে একসময় আশ্রয় দিয়েছিল। এই গাদ্দার বিশ্বাসঘাতকরা আজ তাদেরই আশ্রয়দাতাদের হত্যা করছে নিজ হাতে। মুসলিমদের পবিত্র এই ভূমিকে নিজেদের ভূমি বলে দাবি করছে।

এই বর্বরতার সাক্ষী হচ্ছি আমি ও আমরা। একজন মুসলিম হিসেবে, একজন মানবিক মানুষ হিসেবে এর বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। কেননা, পবিত্র এই ভূমি, এই আকসা মসজিদ শুধু তাদের একার নয়, এই মসজিদ পুরো মুসলিম জাতির। এর রক্ষণাবেক্ষণ পুরো মুসলিম জাতির উপর বর্তায়। আমরা যে যেভাবে পারি ঝাঁপিয়ে পড়ি। জালেমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। বয়ানের মাধ্যমে হোক। কুনুতে নাযেলা পড়ে দোয়ার মাধ্যমে হোক। আর্থিক সহায়তার দিক থেকে হোক। লেখালেখির মাধ্যমে হোক। সর্বোপরি যে যেখানে আছি, যার যেটা সামর্থ্য আছে, সে সেদিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে লিপ্ত থাকা।

বর্তমান তরুণসমাজ যেন এসব বিষয়ে সতর্ক হতে পারে, ইতিহাস-ঐতিহ্য জানতে পারে, বাতিলের বিরুদ্ধে সত্যের কলম ধরতে পারে–এসব কিছুর সুদূর চিন্তাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম আয়োজন করেছে নবীনকণ্ঠ'র এবারের আল-কুদস সংখ্যা।

আমরা আপনাদের কাছ থেকে আশাতীত সাড়া পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। লেখালেখি ও প্রচারের মাধ্যমে আপনারা আমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন। জাযাকুমুল্লাহ খাইর।

আমাদের সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবারের সংখ্যা প্রবীণ ও নবীনদের লেখায় রঙিন হয়ে উঠেছে। আশা ও প্রত্যাশার বিচারে সামান্য হলেও দিতে পারে সাহিত্য, ভাষা ও ইতিহাসের পথিককে বিরাট পাথেয় এবং দৃঢ় প্রত্যয় ও উচ্চাভিলাষ। আমিন ইয়া-রব।

পরিশেষে চির কৃতজ্ঞ আমার প্রাণপ্রিয় ওস্তাদ মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানি হাফিজাহুল্লাহ, প্রিয় ভাই মুফতি আবুল ফাতাহ কাসেমী, মুহা. হাছিবুর রহমান, মুফতি আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী, মুফতি এমদাদুল্লাহ, মুহাম্মদ সায়েম এবং বিন-ইয়ামিন সানিম ভাইসহ নবীনকণ্ঠ পরিবারের সকলের প্রতি। আপনাদের দোয়া, ভালোবাসা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় নবীনকণ্ঠ এতদূর এসেছে। আমি আশাবাদী সকল ঘাত-প্রতিঘাতময় পথ পাড়ি দিয়ে তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে নবীনকণ্ঠ অনেক দূর এগিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। তরুণদের আশার আলোর মশাল হবে এই সাহিত্য সাময়িকী নবীনকণ্ঠ।

যে কথা না বললেই নয়; তা হলো–এই আয়োজনে নানা প্রকার ভুলত্রুটি আমি অকপটে স্বীকার করছি। তাই আশা করি, কারও চোখে কোনো অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে, আমাদের অবগত করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। কেয়ামত পর্যন্ত বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরামের মুখপত্র নবীনকণ্ঠকে মাকবুল ফরমান। আমিন ইয়া-রব।

যদি নবীনকণ্ঠকে 'প্রিন্ট' করে 'অর্থমূল্য' ছাড়া আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম তাহলে ভালো লাগতো। হয়তো ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা সম্ভব করে দিবেন। আমীন। আপাতত পিডিএফ সংখ্যা আপনাদের সামনে তুলে দেয়ার চেষ্টা করেছি। আলহামদুল্লিাহ।

উসমান বিন আব্দুল আলীম
সম্পাদক, নবীনকণ্ঠ

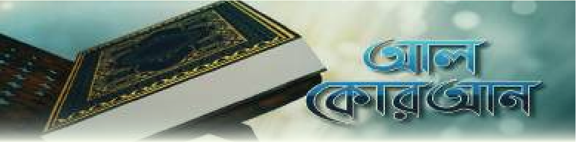

আল কোরআন

হজরত মুসা আ.-এর জবানে আল্লাাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে আমার সম্প্রদায়, এই পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন আর পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। (আল-মায়েদাহ: ২১)

ফিলিস্তিন বা বাইতুল মাকদিস শব্দটির সাথে পরিচিত নয় এমন মুসলমান পাওয়া যাবে না। প্রতিটি মুসলমান এই পুণ্যভূমিকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। কারণ, এ ভূমি হলো, 'আল আরদুল মুকাদ্দাসাহ' তথা পবিত্র ভূমি। আল্লাহ তাআলা এই পুণ্যভূমিতে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন এবং অগণিতবার এই পুণ্যভূমিতে পবিত্র ওহি প্রেরণ করেছেন। হজরত সুলাইমান আ., হজরত দাউদ আ., হজতর যাকারিয়া আ.-এর মতো বড় বড় নবিগণ এখান থেকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন। হজরত ইবরাহিম আ., হযরত লুত আ. ও হজরত মুসা আ.-কে এই পুণ্যভূমিতে হিজরত করার আদেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া-তাআলা নবিদের নামের পাশাপাশি ফিলিস্তিন ও বাইতুল মাকদিস-এর পবিত্রতা, মহত্ব, মর্যাদা ও বরকতপূর্ণ হওয়ার কথা বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

হজরত মুসা আ.-এর জবানে আল্লাাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, এই পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন আর পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। (আল-মায়েদাহ: ২১)

আল্লাহ তাআলা মেরাজের ঘটনা আলোচনায় বাইতুল মাকদিস ও তার আশপাশকে বরকতপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ বলেন, 'পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়, যার চারপাশকে আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'। (বনি ইসরাইল: ১)

ইবরাহিম আ. ও লুত আ.-এর আলোচনা করতে গিয়ে ফিলিস্তিন ভূমিকে বরকতপূর্ণ বলেন, 'আর আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে, যেথায় আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য'। (আল-আম্বিয়া: ৭১)

সুলাইমান আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এবং সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; ওটা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি'। (আল-আম্বিয়া: ৮১)

মুসা আ.-এর ঘটনায় আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুসা যখন আগুনের কাছে পৌঁছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান দিকের বৃক্ষ থেকে তাকে আহ্বান দিয়ে বলা হলো, "হে মুসা, আমিই আল্লাহ, জগৎসমূহের পালনকর্তা"। (আল-কাসাস: ৩০)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'আর তাদের ও যেসব জনপদের মধ্যে আমি বরকত দিয়েছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে আমি অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং তাতে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। (তাদেরকে বলা হয়েছিল) "তোমরা এসব জনপদে রাত-দিন (যখন ইচ্ছা) নিরাপদে ভ্রমণ কর"। (সাবা: ১৮)

ফিলিস্তিন ভূমির ফলের কসম খেয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'শপথ তীন ও যায়তুন-এর' (যা জন্মে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এলাকায়, যে স্থান বহু পুণ্যময় নবি ও রসুলের স্মৃতিতে ধন্য)। (আত-তীন: ১)

মারইয়াম আ. ও তাঁর ছেলে ঈসা আ.-এর ঘটনায় আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এবং আমি মারইয়াম তনয় ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন, তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবনবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে'। (আল-মুমিনুন: ৫০)

উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের সর্বপ্রথম কেবলা এবং ইতিহাসের দ্বিতীয় মসজিদ হলো, বাইতুল মাকদিস। যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনিতে সকল নবির ইমামতি করেন।

এ জন্য বাইতুল মাকদিসকে হেফাজত করা, তাঁর পবিত্রতা রক্ষা করা, সেটি ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা প্রত্যেক মুসলামানের উপর ওয়াজিব। যারা এই পুণ্যভূমিকে রক্ষা করার জন্য নিজেরদের জীবনকে কুরবান করে দিচ্ছেন, তাদের জন্য আমাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য সহযোগিতা করা এবং সর্বদা তাঁদের বিজয়ের জন্য দোয়া করা আবশ্যক। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই ইসলামের পতাকা আল-কুদসের মিনারে উড্ডীন করা হবে। 'তারা ঐদিনটিকে সুদূরে মনে করছে অথচ আমি তা নিকটে দেখতে পাচ্ছি'। (আল-মাআরিজ: ৬,৭)

মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসিন
শিক্ষক ও গবেষক

মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের

হযরত আবুজর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, পৃথিবীতে কোন মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদুল হারাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়, এর পরে কোন মসজিদ নির্মিত হয়? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর পরে মসজিদুল আকসা নির্মিত হয়। পুনরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়,দুই মসজিদের নির্মাণে কত বছরের ব্যবধান ছিল? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুই মসজিদের নির্মাণে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। (সহীহ বুখারী, হাদীছ নং-৩৪২৫)

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। বললেন, ইহুদিদের দিকে চলো। আমরা তার সঙ্গী হলাম। এমনকি আমরা বাইতুল মেদরাসে আসলাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে (ইহুদিদের) বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! ইসলাম গ্রহণ করো,শান্তিতে থাকবে। (শেষাংশে আরো বললেন) জেনে রেখো, জমিন আল্লাহ ও তার রাসূলের এবং আমি চাই এখান থেকে তোমাদের বহিষ্কার করি। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মালের বদলে কোন বস্তু (বিনিময়)পায়,তা যেন সে বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রেখো, জমিন আল্লাহ ও তার রাসূলের রাজত্ব। (সহীহ বুখারী, হাদীছ নং-৬৯৪৪)

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না মুসলিমগণ (বাইতুল মাকদিসের নিকট) ইহুদিদের সঙ্গে লড়াই করবে, আর মুসলিমগণ তাদের হত্যা করবে। এমনকি ইহুদি গাছের বা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করবে, আর পাথর বা গাছ বলবে, হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে আমার পিছনে ইহুদি। এসো, তাকে হত্যা করো। তবে 'গারকাদ' ছাড়া, সেটা হলো ইহুদিদের গাছ। (সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ২৯২২)

ফায়দা-

মসজিদুল হারামের পর মসজিদে আকসা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম মসজিদ। এর গৌরবময় ঐতিহ্য ও সম্মান রয়েছে। ফিলিস্তিনের পবিত্র শহর "আল-কুদস"-য়ে তা অবস্থিত। প্রতিটি মুসলিম হৃদয়ের অখন্ড ভক্তি-শ্রদ্ধা আর অফুরন্ত প্রেম-ভালোবাসার বিমূর্ত প্রতীক আলআকসা- আলকুদস। তবে নির্মম সত্য হলো,আজ পবিত্র এই শহরের ঐতিহ্য বিপণ্ন হয়ে তা অভিশপ্ত দখলদার ইহুদিদের নগ্ন হস্তক্ষেপের শিকার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ইহুদিদের চরম বিদ্বেষ ও বিরোধিতার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সেই বিদ্বেষ আর বিরোধিতার ধারাবাহিকতায় আজকের এই ফিলিস্তীনী সংকট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় ইহুদিদের আরব জাজিরা থেকে বহিষ্কারের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। এমনকি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তিতে এদেরকে আরব হতে বহিষ্কার করেছেন।

এই ইহুদি জাতির শেষ রক্ষা হবে না। মুসলিমগণ হযরত ইসা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে ইহুদিদের সঙ্গে লড়াই করে এদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করবে। 'গারকাদ' গাছ ছাড়া যেই গাছের বা পাথরের আড়ালে তারা আত্মগোপন করবে,ঐ গাছ বা পাথর বলে দিবে যে, আমার পিছনে ইহুদি লুকিয়েছে। এসো, তাকে হত্যা করো। সেই পরিণতির দিকে তারা দ্রুত এগোচ্ছে! বিজয়ের হাসিটা অচিরেই মুসলমানদের মুখে ফুটবে! ইনশাআল্লাহ। সেই প্রতীক্ষায়।

প্রধান মুফতী, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ,ঢাকা।

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের শত বছরের তাণ্ডব

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

কয়েক শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনে আরবদের বসবাস। যুগে যুগে এই পুণ্যভূমিতে প্রেরিত হয়েছেন বহু নবি-রাসুল। তাঁদের সমাধিস্থলও এর আশপাশেই অবস্থিত। গাজা ফিলিস্তিনের একটি বিশিষ্ট অঞ্চল। গাজা থেকে মাত্র দুই মাইল উত্তরে কিবুটস নামক এলাকা। ১৯৩০-এর দশকের কথা। পোল্যান্ড থেকে এসে কয়েকটি ইহুদি পরিবার কিবুটস এলাকায় বসবাস শুরু করে এবং ওই এলাকায় তারা কৃষি খামার গড়ে তোলে। আরবরাও তখন কৃষিকাজে অভ্যস্ত ছিল। তাই পরস্পর মিলেমিশে কৃষিকাজের মাধ্যমে উভয় জাতি বসবাস করতে শুরু করে।

ইহুদিরা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই চলছিল। সরল ফিলিস্তিনিরাও নির্দ্বিধায় তাদের স্থান দেয়। কিন্তু খুব শিগ্‌গির ১৯৩০-এর দশকেই ফিলিস্তিনিরা বুঝতে পারল যে, তারা ধীরে ধীরে নিজেদের জমি হারাচ্ছে। এরই মধ্যে ইহুদিরা দলে দলে সেখানে আসতে থাকে এবং জমি ক্রয় করে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। মূলত ইউরোপীয়দের একটি দুরভিসন্ধি ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইন্ধন জোগাচ্ছিল। ইউরোপীয়রা ইহুদিদের তাদের আশপাশে থাকা কোনোভাবেই পছন্দ করত না। তাই তারা মধ্যপ্রাচ্যে একটি ইহুদি উপনিবেশ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিল। ইউরোপে ইহুদিদের প্রতি যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সেটি তাদের একটি নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের ভাবনাকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। ফলে জাহাজে করে হাজার হাজার ইহুদি অভিবাসী ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আসতে থাকে।

বিশেষ করে ১৯৩৩ সালের পর থেকে জার্মানির শাসক হিটলার ইহুদিদের প্রতি কঠোর হতে শুরু করেন। প্রসিদ্ধি আছে, তাঁর নেতৃত্বে প্রায় ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। বেঁচে যাওয়া ইহুদিরা ফিলিস্তিনে এসে একত্র হতে থাকে। তখন ফিলিস্তিনি আরবরা ভালোভাবেই বুঝতে পারে যে, তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের কর্তৃত্ব ছিল তুরস্কের সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে তুরস্কের সেনাদের হাত থেকে জেরুজালেম দখল করে নেয় ব্রিটেন।

তখন ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদিদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে তারা সহায়তা করবে। ব্রিটেনে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার জেমস বেলফোর বিষয়টি জানিয়ে ইহুদি আন্দোলনের নেতা ব্যারন রথসচাইল্ডকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি 'বেলফোর ডিক্লারেশন' হিসেবে পরিচিত। ইহুদিরা তাদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। ব্রিটেনের সহায়তায় সে অনুযায়ী তারা কাজ এগিয়ে নেয়। ইহুদিদের দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় ব্রিটিশ সরকার। তখন ফিলিস্তিনি আরবরা বুঝতে পারে যে, তাদের অস্তিত্ব সংঘাতময় হতে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনি আরবরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিদ্রোহ করে। তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল ব্রিটিশ সেনা ও ইহুদি নাগরিকরা।

কিন্তু আরবদের সে বিদ্রোহ ব্রিটিশরা কঠোর হস্তে দমন করে। এতে আরব-সমাজে ভাঙন সৃষ্টি হয়। ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে ব্রিটেন হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অবস্থান জোরালো করতে চেয়েছিল। সেজন্য আরব ও ইহুদি দুই পক্ষকেই হাতে রাখার রাজনীতি শুরু করে ব্রিটেন।

১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি ব্রিটেনের সরকার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে, যেখানে বলা হয়েছিল, পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য মাত্র ৭৫ হাজার ইহুদি অভিবাসী আসতে পারবে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে। এর বেশি আসতে পারবে না।

ব্রিটেনের এধরনের পরিকল্পনাকে ভালোভাবে নেয়নি ইহুদিরা। তারা একসঙ্গে ব্রিটেন ও হিটলার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা করে। তখন ৩২ হাজার ইহুদি ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়। পরে তারাই আরব ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে দুটি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘ। একটি ইহুদিদের জন্য এবং অন্যটি আরবদের জন্য। আর জেরুজালেম থাকবে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে। জাতিসংঘ বিভিন্নভাবে অন্যায় করেছে। আরবদের রাষ্ট্রে ইহুদিদের ভাগ দিয়েছে।

ইহুদিরা মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশের মালিক হলেও তাদের দেওয়া হয় মোট জমির অর্ধেক। এ ছাড়া আরবদের দেশ ফিলিস্তিনের রাজধানী তাদের না দিয়ে সংঘাত চালু রাখার ষড়যন্ত্র করেছে। তাই আরবরা স্বভাবতই জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের ভূখণ্ডে ইহুদিরা স্বাধীন ভূখণ্ডের ঘোষণা পেয়ে তারা বিজয়-উল্লাস করে। তখন থেকেই ইহুদিদের সশস্ত্র দলগুলো প্রকাশ্যে আসা শুরু করে। আরবদের মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। ছিল না যোগ্য নেতৃত্ব। আরব দেশগুলো ছিল বিলাসিতায় মগ্ন। এ সুযোগে ইহুদিরা তাদের বিচক্ষণতা ও কৌশলে এগিয়ে যায়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে ইহুদি সশস্ত্রদের নৃশংস হামলায় বহু ফিলিস্তিনি আরব তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রায় সাত লাখের মতো লোক তখন বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। তারা আজও বাড়ি ফিরতে পারেনি। ইসরায়েল অংশে যেসব ফিলিস্তিনি বসবাস করে আসছিল, তাদের ওপর নেমে আসে সীমাহীন দুর্ভোগ। পদে পদে নিজ ভূমিতেই নির্যাতিত সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যায় ব্রিটেন। একই দিন তৎকালীন ইহুদি নেতারা ঘোষণা করে যে, সেদিন রাতেই ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম হবে। ইসরায়েল রাষ্ট্র জন্মের ঘোষণামাত্রই মিসর, ইরাক, লেবানন, জর্দান ও সিরিয়া যৌথভাবে ইসরায়েলের ওপর আক্রমণ করে। তীব্র লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ইসরায়েলি বাহিনী পিছু হটতে থাকে।

জাতিসংঘ ইসরায়েলের পরাজয় আঁচ করতে পেরে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। বিরতির সুযোগে ইহুদিরা শক্তি সঞ্চয় করে। তখন চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকে প্রচুর আধুনিক অস্ত্রের চালান আসে ইসরায়েলের হাতে। নতুন করে তারা আরবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নেয় ইসরায়েলিরা। তেল আবিব ও জেরুজালেমের ওপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। জাতিসংঘের মাধ্যমে আরেকটি যুদ্ধবিরতি আসে। ইসরায়েলিরা বুঝতে পারে তারা একটি ভূখণ্ড দখল করেছে ঠিকই, কিন্তু লড়াই এখনো থামেনি। তবে ১৯৪৮ সালের পর থেকে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে যাচ্ছে ইসরায়েল।

ফিলিস্তিন নির্যাতনের করুণ ইতিহাস

ফিলিস্তিনি আরবরা চরম হতভাগ্য জীবন যাপন করছে। ১০০ বছর ধরে চলছে তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন, বর্বর পাশবিক হামলা। নিজেদের ভূখণ্ডে দখলদার ইহুদিদের হাতে প্রতিনিয়ত তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ইসরায়েলের চলমান প্রেক্ষাপটে লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। নারী, শিশু ও অসহায় মানুষ হতাহতের কোনো গণনা-ই নেই।

আন্তর্জাতিক হিসাব অনুযায়ী ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনি শরণার্থীর সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। তাদের ঘরবাড়ি ফিরে পাওয়া তাদের যৌক্তিক অধিকার। যুদ্ধবিরতির নামেও আন্তর্জাতিক মহল থেকে চলে ষড়যন্ত্র। যখন ইসরায়েলের পরাজয়ের সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসে, তখন আন্তর্জাতিক মদদদাতারা যুদ্ধবিরতির জন্য মায়াকান্না শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র একদিকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান করে, অন্যদিকে ইসরায়েলকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র দিচ্ছে।

এমন কাণ্ড ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র ও ভয়ংকর ধোঁকাবাজির নামান্তর। গাজার মতো অত্যন্ত ঘনবসতি একটি জনপদে নির্বিচারে বোমা হামলা খুবই উদ্বেগজনক, হতাশাজনক ও মর্মান্তিক বিষয়। মানবতা সেখানে বিপন্ন হচ্ছে পদে-পদে। নিজেদের ভূমিতে নিজেদের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে চরমভাবে।

লেখক : গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার । বসুন্ধরা,ঢাকা । উপদেষ্টা, নবীনকণ্ঠ (ম্যাগাজিন)

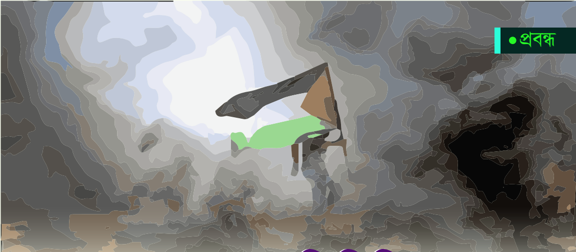

আমাদের ফিলিস্তিন

● মূলঃ এনায়েতুল্লাহ ওয়ান নদবি
● অনুবাদ ও সংযোজন, মুফতী ইমদাদুল্লাহ

ফিলিস্তিন ও বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাস : মুসলমানগণ এই বিশ্বাস করেন যে, তারাই হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামসহ বনি ইসরাইল সকল নবি ও নেককারদের উত্তরাধিকার সম্পত্তির প্রকৃত এবং আসল ওয়ারিস। কারণ সেই নবি ও নেককারগণ ফিলিস্তিনের ভূমিতে তাওহিদের পতাকাতলে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। সেখানকার রাষ্ট্র পরিচালনার শরয়ি ও আইনি অধিকার মুসলমানদের কাছেই এসেছে; কেননা তারাই সেই নবি-রাসুলগণের পর তাওহিদের একমাত্র পতাকাবাহী। এবং সেই নবিগণের রাস্তার প্রকৃত পথিক। মুসলমানগণ এই বিশ্বাস রাখে যে, ইহুদিরা হকপথ থেকে বিচ্যুত। তারা নিজেদের কাছে প্রেরিত আসমানি গ্রন্থে তাহরিফ বা পরিবর্তন করেছে।নিজেদের কাছে আসা নবিগণকে হত্যা করেছে। ফলে তারা আল্লাহর কাছেঘৃণিত হয়েছে। তাই পুরো ফিলিস্তিনের ভূমিতে শাসন করার শরয়ি এবংলিগ্যালি অধিকার কেবল মুসলমানদেরই আছে। ইতিহাসগ্রন্থে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, মুসলিমগণ যখন ফিলিস্তিন বাবাইতুল মাকদিস শাসন করেছিলেন, তখন তারা পক্ষপাতিত্বমূলক শাসন করেননি।বরং ইনসাফের শাসন করেছেন। অন্যদের অধিকার ও পাওনাগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বিপরীতে অন্যরা যখন শাসন করেছিল, তখন তাদের শাসন ছিল পক্ষপাতিত্ব নির্ভর। ফলে অন্য ধর্মের মানুষদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ অপাঙ্ধসঢ়;ক্তেয়।

ফিলিস্তিন বিষয়ক জায়োনিজম দাবির বাস্তবতা :

ইহুদিরা দাবি করে, ফিলিস্তিন শাসনে তাদের ঐতিহাসিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু তাদের এই দাবি ফিলিস্তিনের প্রকৃত আরব মুসলিম বাসিন্দাদের অধিকারের সামনে একদম ভিত্তিহীন; কেননা এখানকার প্রকৃত বাসিন্দাগণ বনি ইসরাইলের 'দাউদ রাজ্য' বা ডেবিড এ্যাম্ফায়ার প্রতিষ্ঠার ১৫০০ বছর পূর্বে এই ভূমি আবাদ করেছিল। দাউদ আলাইহিস সালামের শাসনব্যবস্থার সময়ও তারা এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফিলিস্তিনের এই ভূমি থেকে যখন ইহুদিরা দেশান্তরিত হয়েছিল, তখনো এখানকার প্রকৃত বাসিন্দাগণ এখানেই ছিল। এবং আজ পর্যন্ত তারা এখানেই হাজির। ইহুদিরা প্রায় চার শতাব্দী সময়কাল ব্যাপী ফিলিস্তিনের কিছু এলাকায় শাসন করেছিল।

> অনুশীলন করো বেশী লিখে এবং পরিবেশন করো কম লিখে; তুমি হবে সফল লেখক। তোমার লেখা হবে হৃদয়স্পর্শী ও কালোত্তীর্ণ।
> (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

১০০৪ -৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্ব সময়ের মধ্যখানে। এরপর ফিলিস্তিনে তাদের শাসন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। যেমনটি নিঃশেষ হয়েছিল এই ভূমিতে শাসনকারী অন্যান্য গোষ্ঠির শাসনকাল। যাদের মধ্যে ফরাসি বা ইরানি, মিসরের ফারাও, রোম সাম্রাজ্য, আফ্রিকান সাম্রাজ্য এবং আশেরীয়রা উল্লেখযোগ্য। এদের সবাই ফিলিস্তিনে শাসন করেছিল। এবং একসময় সকলে শাসনের সমাপ্তিতে এই ভূমি ছেড়ে তারা চলে গিয়েছে। কিন্তু ফিলিস্তিনের প্রকৃত বাসিন্দাগণ এই ভূমিতে সব সময়েই ছিল উপস্থিত। তারা নিজেদের ভূমি ছেড়ে যায়নি। এখানকার এই বাসিন্দাগণই ১৫ হিজরি মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইসলামের ছায়াতলে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

ফিলিস্তিনে মুসলমানদের শাসনকালই সবচেয়ে দীর্ঘ ছিল। মধ্যখানে ক্রুসেডারদের ৯০ বছর বাদ দিলে প্রায় ১২০০ বছর ফিলিস্তিন ও আল-কুদস মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। অর্থাৎ, ৬৩৬ খ্রি. থেকে ১৯১৭ খ্রি. পর্যন্ত। ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ১৮০০ বছর ফিলিস্তিনের এই ভূমির সাথে ইহুদিদের কার্যত কোনো সম্পর্ক ছিল না। বর্তমান ইহুদি জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ ইহুদির সাথে ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক কোনো সম্পর্ক নেই। ইহুদি আর্থার কোস্টলারের মতো বিখ্যাত লেখকের গবেষণা থেকে এটি প্রমাণিত। তাছাড়া বনি ইসরাইলের সাথে বর্তমান ইহুদিদের জাতিগত এবং বংশগত কোনো সম্পর্কও নেই। কারণ এদের অধিকাংশের সম্পর্ক আল-খুরয ইহুদি বংশ 'আশকানাযে'র সাথে। আর এরা তো তাতারি গোষ্ঠীভুক্ত। যারা উত্তর ককেশাসের অধিবাসী ছিল। অষ্টদশ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে এরা ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এদের যদি নিজেদের ভূমিতে ফিরে যাওয়ার কোনো অধিকার
থাকে, তবে সেই অধিকার ফিলিস্তিনের ভূমিতে নয় বরং দক্ষিণ রাশিয়ার এলাকায়। ইহুদিরা আরেকটা দাবি করে, ফিলিস্তিনের সাথে তাদের সব সময় গভীর সম্পর্ক ছিল। এই দাবিও অবাস্তব। বনি ইসরাইলের অধিকাংশ লোকজনই তো মুসা আলাইহিস সালামের সাথে পবিত্র ভূমিতে যেতে অস্বীকার করেছিল। এমনিভাবে ইরানি বাদশা দ্বিতীয় কোরাশ যখন তাদের দ্বিতীয়বার ফিলিস্তিনে বসবাস করানোর প্রস্তাব করে, তখন তারা ইরাকের ব্যবিলন নগরী ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে। আজ পর্যন্ত পুরো ইতিহাসে ফিলিস্তিনে জোর-জবরদস্তি করে বসবাসকারী ইহুদিদের সংখ্যা তাদের মোট জনসংখ্যার ৪০ পার্সেন্টের বেশি না। যেই জাতির সাথে ফিলিস্তিনের সম্পর্ক এই যৎসামান্য, তারাই সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের তাড়িয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব করছে। ১৯১৭ পর থেকে এই ২০২৩ পর্যন্ত বছরগুলো তারা অসংখ্য স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে নিজেদের ভূমি
থেকে জোরপূর্বক দেশান্তর হতে বাধ্য করেছে। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বেলফোর নামক অভিশপ্ত ঘোষণার পর থেকে জায়নবাদীরা ফিলিস্তিনে আসা শুরু করে। ১৯১৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সময়কাল যাবৎ ফিলিস্তিনে ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল। এই সন্ত্রাসীরাই জায়নবাদীদেরকে ফিলিস্তিনে এনেছে, নিজেদের নোংরা চরিত্র বাস্তবায়ন করতে। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশের শুরুতে ফিলিস্তিনের পুরো ভূমিতে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫,০০০ অর্থাৎ, সেখানকার মোট জনসংখ্যার ৮ পার্সেন্ট মাত্র। সেই ইহুদিদের সংখ্যা ১৯৪৮ সালে গিয়ে দাঁড়াল ৬ লাখ। অর্থাৎ, মোট জনসংখ্যার ৩১.৭ পার্সেন্ট। ব্রিটেনের সাদা সন্ত্রাসীগুলো একটা জাতি, একটা ভূমি এবং একটা দেশকে ধ্বংস করার কী চেষ্টাটাই করেছে! এরপর ইউরোপের এই ভদ্রতার বেশধারীরা ফিলিস্তিনকে ভাগ করতে বসল। ৬৯ পার্সেন্ট স্থানীয় মুসলিম ফিলিস্তিনিদেরকে দিল মোট আয়তনের ৪৫ পার্সেন্ট। আর ৩১.৭ পার্সেন্ট ইহুদিদেরকে দিল মোট আয়তনের ৫৪ পার্সেন্ট। তারপর ইসরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্র ঘোষণা হয়। ঘোষণার সময়েও তারা নিজেদের জন্য ব্রিটেনের বরাদ্ধকৃত জমিন থেকে বেশি নিয়ে ঘোষণা করে। ১৯৪৮ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ফিলিস্তিনি মুসলিমদেরকে (৫৬ লাখ মানুষকে) তাদের মূল ভূমি থেকে হিজরত করতে বাধ্য করে। আর হত্যা-গুমের তো কোনো হিসেব নেই।

১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত জায়নবাদীদের দখল চলছেই। আশপাশের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কোনো সময় তাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেও, নিজেদের লোভ আর ভয়ের কারণে তারা বেশিরভাগ সময় ইসরাইল ও আমেরিকাকে চোষণ করে গেছে। ইসরাইলের জায়নবাদীদেরকে প্রথমে ব্রিটেন সহযোগিতা করলেও, পরে এরাই ব্রিটেনকে ধ্বংস করে দেয়।এরপর থেকে তাদের প্রকাশ সাপোর্টার বনে যায় মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী আমেরিকা। আর পরোক্ষ সাপোর্টার হয়, অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র। এমনকি মুসলিম নামধারী রাষ্ট্রগুলোও। দীর্ঘ সময় যাবৎ নির্যাতন, নিপীড়ন আর দুর্ভোগ পোহানোর পর ফিলিস্তিনবাসীসহ আমরা মুক্তির কিছুটা নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ আল-কুদস ও ফিলিস্তিনের মুসলিমদের বিজয় তরান্বিত করেন। হামাসকে ভরপুর সাহায্য করেন। আমিন।

বাইতুল মাকদিস তুমি কার?

● মুফতী যুবাইর মাহমুদ রহমানী

মসজিদুল আকসা মর্যাদাগত দিক থেকে বিশ্বের তৃতীয়তম মসজিদ। এটাই মুসলমানদের চিরায়ত আকিদা বা বিশ্বাস। প্রশ্ন হচ্ছে, এ পবিত্র মসজিদের প্রকৃত ওয়ারিস কারা? কারা এর আসল উত্তরাধিকারী? এ প্রশ্নের জবাবের আগে বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা কিঞ্চিত আলোকপাত করব, গাজা, হামাস ও ইসরায়েল নিয়ে।

গাজা :

ফিলিস্তিনের দুটি অংশ। একটি পশ্চিম তীর। অপরটি গাজা। মাঝখানে অবৈধ জারজ রাষ্ট্র ইসরায়েল। লেখক তাহমীদুল ইসলাম লিখেন : 'ইসরাইল দখল করতে করতে ফিলিস্তিনকে এমনভাবে দখল করেছে যে, একপাশে গাজা উপত্যকা; অন্যপাশে পশ্চিম তীর। মাঝখানে ইসরাইল। ব্যাপারটা অনেকটা পূর্বপাকিস্তান আর পশ্চিম- পাকিস্তানের মতো। পশ্চিম তীর আর গাজা, মাঝখানে ভারতের মতো ইসরাইল। বোঝার সুবিধার্থে মনে করুন, গাজা হচ্ছে বাংলাদেশ, পশ্চিম তীর পাকিস্তান। মাঝখানে ভারত হচ্ছে ইসরাইল। (ভৌগোলিক অবস্থান বা ম্যাপ বোঝার সুবিধার্থে বললাম।)'

হামাস :

হামাসের পূর্ণ নাম হচ্ছে 'হরকাতুল মোকাওমাতুল ইসলামিয়া' (হামাস হচ্ছে মূলত উক্ত নামের সংক্ষিপ্ত রূপ)। হামাস এবং পিএলও-এর পরিচয় দিতে উপর্যুক্ত লেখক লিখেন, 'পিএলও আর হামাস হচ্ছে ফিলিস্তিনের দুটি রাজনৈতিক দল। হামাস সংখ্যাগরিষ্ঠ গাজাতে আর পিএলও পশ্চিম তীরে। তবে ২০০৬ সালে পুরো ফিলিস্তিনের নির্বাচনে হামাস পিএলওর উপরে জয়লা করে ফিলিস্তিনের ক্ষমতায় আসে। ইসমাঈল হানিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়। মাহমুদ আব্বাস প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা দখল করে নেয়। অনেকটা পাকিস্তানের নির্বাচনের মতো; শেখ মুজিবুর রহমা নির্বাচিত হয়েও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। ইসমাইল হানিয়ার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটে। এরপর থেকে ইসমাঈল হানিয়া তার এলাকা গাজাতেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকেন। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার মতো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ফিলিস্তিন নিজেই তো স্বাধীন নয়। মাহমুদ আব্বাসের পিএলও ইসরাইলি সকল শর্ত মেনে ফিলিস্তিন তথা পশ্চিম তীরকে ডিমিলিটাইরাইজড করলেও গাজার হামাস সেটা মেনে নেয়নি পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি শর্ত অনুযায়ী কোনো সেনাবাহিনী নেই। সিকিউরিটি ফোর্স আছে, যাদের নামে মাত্র একটা পুলিশ ফোর্স আছে। যেটা আছে তাদেরও শর্ত হচ্ছে ইসরাইলি পুলিশকে সাহায্য করতে হবে। তাদের কোনো ভারী অস্ত্র নেই। হাল্কা অস্ত্র যা আছে, সেটাও ইসরাইলের দেওয়া। ওদের গাড়িও ইসরাইলের দেওয়া। যা ইসরাইল সবসময় ধ্বংস করে।

তোমার জান্নাত তোমার মায়ের পাক কদমের নিচে, যিনি একজন নারী।
তো কোন নারীকে অসম্মান করে কীভাবে যেতে পারে কেউ জান্নাতে?

কোনো ফিলিস্তিনিকে জোর করে বেআইনিভাবে ধরে নিয়ে গেলেও ফিলিস্তিনি সিকিউরিটি ফোর্স কিছু করতে পারে না। এজন্য পশ্চিম তীরের যেকোনো বাড়িতে ইসরাইলি পুলিশ চাইলে যেকোনো সময় তল্লাশি চালাতে পারে। আমরা যে পাথর ছোড়ার দৃশ্য দেখি, এগুলো বেশিরভাগই পশ্চিম তীরের। কারণ তাদের অস্ত্র রাখার অনুমতি নেই। ইচ্ছে হলেই যে ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়ে দখল করে নেয়, সেটাও পশ্চিম তীরে। কারণ পশ্চিম তীর ইসরাইলি অকিউপ্যাশনে। এখানকার বাসিন্দারা মোটামুটি চলাচলের স্বাধীনতা পেলেও ঘরবাড়ি কখ বেদখল হয়ে যাবে বলতে পারে না। এতে আলফাতাহ বা পিএলও কিছু করতে পারে না। অন্যদিকে হামাস শাসিত গাজা উপত্যকা ইসরাইলের কোনো শর্ত মানে না। তাদের মিলিটারি আছে। তাদের অঞ্চলে ইসরাইলি পুলিশ ঢুকতে পারে না। তারা নিজেরাই সেখানকার নিরাপত্তা দেয়। তাদের আর্টিলারি ইউনিট আছে। তাদের কাছে ভারী অস্ত্র আছে। যার বেশিরভাগ তারা নিজেরাই তৈরি করে। এখানে ইসরায়েলি সেটেলাররা তো দূরের কথা, ইসরাইলি পুলিশ বা ইসরায়েলি আর্মীও ঢুকতে পারে না। ইসরাইলের শর্ত মেনে না নেওয়ায় গাজা উপত্যকায় ইসরাইল চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। গাজার দুইদিকে ইসরাইল একদিকে মিশর আরেকদিকে সমুদ্র। তাদের উপর ইসরাইল ল্যান্ড, এয়ার এন্ড সী ব্লক দিয়ে রেখেছে। গাজা উপত্যকাকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জেলখানা। মিশর সীমান্তে আব্দেল ফাত্তাহ সিসি দেয়াল তুলে দিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের চলাচলের জন্য মাটির নিচে সুরঙ্গ ছিল, সেগুলো সে বন্ধ করে দিয়েছে। মুহাম্মদ মুরসি ক্ষমতায় আসার পর যখন মিশর সীমান্ত ফিলিস্তিনিদের জন্য খুলে দেয়, তখন ইসরাইল মুরসিকে সবচেয়ে বড় থ্রেট হিসেবে নেয়। ইসরাইল, সৌদি ও আমিরাত জোট মুরসিকে হটিয়ে সিসিকে ক্ষমতায় আনে। সে সময়ে সিসিকে সবার আগে অভিনন্দন জানায় সৌদি আরব। যদিও ইসরাইলের উদ্দেশ্য আর তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, লক্ষ্য ছিল একই। কপাল পোড়ে ফিলিস্তিনিদের।এরপর থেকেই ফিলিস্তিনের জন্য সেই সীমান্ত বন্ধ হয়ে যায়। সুরঙ্গ পথ ব্যবহারের জন্য মিশর সীমান্তে যে ঘরবাড়িগুলো ছিল, বুলডোজার দিয়ে সেসব বাড়িও ভেঙে দেয় মিশর।

ইসরাইল :

ইসরাইল একটি অবৈধ জারজ রাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোড়া বলা হয় একে। মূলত ইসরাইলে যে সমস্ত ইহুদির বসবাস, তাদের অধিকাংশই ইউরোপ থেকে এসেছে। এ প্রসঙ্গে লেখক তাহমীদুল ইসলাম লেখেন– 'ইসরাইলে যারা শাসন করে তারামূলত ইউরোপীয় ইহুদি। এদেরকে বলা হয় অংযশবহ্ধর ঔবরিংয (আশকেনাজি জিউশ)। এরা ইউরোপ থেকে এসে ফিলিস্তিন-ভূখণ্ডে গেড়ে বসা ইহুদি কিছু আরব ইহুদি আছে যারা আগে থেকেই ফিলিস্তিনে ছিল আর কিছু অন্যান্য আরব দেশ থেকে এসেছে। এদেরকে বলা হয় গরুৎধযর ঔবরং (মিজরাহি জিউশ)। ঐরংঢ়ধহরপ (হিস্পানিক) কিছু জিউশ বা ইহুদি আছে। তবে এলিট শ্রেণি হচ্ছে আশকেনাজি জিউশ সম্প্রদায়। এরাই মূলত জার্মান আর ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিলিস্তিনিদের জমি দখল করেছে। এরা অসম্ভব উগ্র, জেনোফোবিক এবং প্রচুর টাকাওয়ালা। ইসরাইলের এলিট শ্রেণি হচ্ছে এরা। এদের কালচারের সাথে আরব ইহুদিদের কালচার কোনোভাবেই মিলে না। ইহুদি ধর্ম অনুযায়ী মেসিয়াহ (হাদিসে যাকে বলা হয়েছে মাসিহে দাজ্জাল) না আসা পর্যন্ত ইহুদিদের জন্য আলাদা দেশ গঠন করা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ।এই কারণেই অন্যান্য দেশের অর্থোডক্স ইহুদি এবং ইহুদি ধর্মগুরুগণ ইসরাইলে বিরোধী। কারণ এই রাষ্ট্র ইহুদি ধর্মমতেও নিষিদ্ধ। অর্থোডক্স ইহুদি মানে কঠোরভাবে পর্যবেক্ষক এবং ধর্মতাত্ত্বিকভাবে সচেতন ইহুদি। এরা বেশ গোঁড়াপন্থি।'

ইসরায়েলের বৈষম্য ও অমানবিকতা :

স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি মুসলমানদের প্রতি সন্ত্রাসী ইসরাইলের বৈষম্য ও নিপীড়ন সম্পর্কে তাহমীদুল ইসলাম লেখেন– 'ইসরাইল শুরু থেকেই বৃটিশ ও আমেরিকানদের প্রত্যক্ষ সাপোর্ট পেয়ে আসছে। আরব ও ইসরাইল যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যরা ইসরাইলের পক্ষে যুদ্ধ করেছে বলেও বলা হয়। এখনো যখন ইসরাইল ফিলিস্তিনিদেরকে হত্যা করে, নারী-শিশুদেরও হত্যা করে, ধরে নিয়ে যায়, এ নিয়ে জাতিসংঘ ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব আনলে আমেরিকা ভেটো দেয়। সরাসরি ইসরাইলকে রক্ষা করে। জাতিসংঘের আইন, আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার, যুদ্ধাপরাধ আই সবকিছুই তারা নিয়মিত লঙ্ঘন করে। কিন্তু তাতে তাদের কোনো কিছুই হয় না। কারণ আমেরিকা আছে। তারা প্রকাশ্যেই ইসরাইলকে রক্ষা করে নেয়, একদম নগ্নভাবে। ইসরাইলের কোনো সীমানা নেই। কারণ তারা প্রতিদিনই দখল করে চলেছে। যেকোনো দিন ইহুদি সেটেলার এসে আপনাকে বলবে–এই ঘর আমার। এরপর ইসরাইলি পুলিশ এসে আপনাকে বের করে দেবে, পুরুষদের জেলে নিয়ে যাবে। তারপর বুলডোজার এসে আপনার ঘর গুঁড়িয়ে দেবে। এরপর সরকারি টাকায় সেখানে ইহুদিদের জন্য ঘর বানানো হবে নিজেদের শত শত বছরের ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়া ফিলিস্তিনিরা একদিনেই উদ্বাস্তু হয়ে গেল। রিফিউজি হিসেবে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে এভাবে তারা প্রতিদিন ঘরবাতি দখল করে নেয় আর ফিলিস্তিনিরা উদ্বাস্তু হয়। ইহুদিদের জন্য ঘরবাড়ি বানাতে যে টাকা খরচ হয়, তার জন্যও আমেরিকা থেকে সরকারি ও বেসরকারিভাবে টাকা আসে। আবার প্রতিবছর ইসরাইলের জন্য প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার সামরিক সহায়তা আসে। পশ্চিমের দেশগুলোতে ইসরাইলিদের জন্য ভিসা প্রায় ফ্রি। নামিদামি ইউনিভার্সিটিগুলোতে তারা স্কলারশিপ পায়। এরবাইরে আবার প্রায় সব বড় বড় কোম্পানির বিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্ট আছে ইসরাইলের। তারা শিক্ষা খাতে ইনভেস্ট করে, গবেষণা খাতে ইনভেস্ট করে, ট্যুরিজমখাতে ইনভেস্ট করে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরা আগামীকাল পর্যন্ত তাদের বাড়িটা থাকবে কি-না জানে না। প্রাণ থাকবে কি-না সেটাও জানে না। স্কুলটা থাকবে কি-না তাওজানে না। রাত-বিরাতে এসে তল্লাশি চালিয়ে ইসরাইলি পুলিশ যাকে-তাকে ধরে নিয়ে যায়। অল্পবয়সী শিশু হলেও কোনো রক্ষা নাই। ফিলিস্তিনিদের সেনাবাহিনী কিংবা পুলিশ ফোর্স রাখারও পারমিশন নাই। ফিলিস্তিনি সিকিউরিটি ফোর্স নামে একটা বাহিনী আছে, তাদের ভারী কোনো অস্ত্র রাখার অনুমতি নাই।

ইসরাইলের সাথে এক চুক্তিতে এটা মেনে নেয় ইয়াসির আরফাতের পিএলও। ফলে মাহমুদ আব্বাস নামের প্রেসিডেন্ট হলেও কাজে কোনো ক্ষমতা তার নাই।' উপর্যুক্ত লেখক আরও লেখেন– 'ইসরাইলিরা পৃথিবীর ১৬০টি দেশে প্রায় ফ্রি ভিসায় ঘুরতে পারলেও ফিলিস্তিনিরা এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় যেতে ইসরাইলের অনুমতি নিতে হয়। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা থেকে যদি কেউ ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে যেত চায়, তাহলে অনেকদিন আগে অ্যাপ্লাই করতে হয় তাও ৯০% ক্ষেত্রে অনুমতি পাওয়া যায় না। জিজ্ঞাবাদে ইসরাইল সন্তুষ্ট হলেই কেবল অনুমতি দেয়। বেশিরভাগ গাজাবাসী কখনো আল আকসা মসজিদ চোখেও দেখেনি। কারণ আল-আকসা পশ্চিমতীরে।'

> কোনো ফিলিস্তিনিকে জোর করে বেআইনিভাবে ধরে নিয়ে গেলেও ফিলিস্তিনি সিকিউরিটি ফোর্স কিছু করতে পারে না। এজন্য পশ্চিম তীরের যেকোনো বাড়িতে ইসরাইলি পুলিশ চাইলে যেকোনো সময় তল্লাশি চালাতে পারে।

বায়তুল মাকদিস বা মসজিদুল আকসা :

পবিত্র কাবা শরিফ ও মসজিদে নববির পরই বায়তুল মাকদিস বা মসজিদুল আকসার মর্যাদা। পবিত্র মসজিদুল আকসা মুসলমানদের প্রথম কেবলা। হাদিস শরিফে

এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সা. মক্কায় থাকাকালীন কাবাকে সামনে রেখে জেরুজালেমের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। মদিনায় হিজরতের পরও ষোলো মাস পর্যন্ত এভাবে সালাত আদায় করেছেন। এরপর কিবলা কাবার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। (সহিহ বুখারি : ৪০)উপরন্তু, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মেরাজের সূচনাস্থল এই মসজিদুল আকসা। নবি রাসুলগণের স্মৃতির স্মারক এবং গুনাহ মাফের স্থান। এতে এক রাকাতে এক বর্ণনায় পঁচিশ হাজার রাকাতের সওয়াব। শেষ জমানার মুমিনদের কাঙ্ক্ষিত স্থান। এছাড়া, মসজিদুল আকসার রয়েছে আরও অনেক ফজিলত ও তাৎপর্য।

প্রাণের স্পন্দন আল আকসার ওয়ারিস কারা?

পবিত্র মসজিদে আকসা পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার বড় বড় তিনটি মসজিদের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ। এ মসজিদের ঈশ্বকৃত ওয়ারিস কারা? কারা এতে

সালাত কায়েমের অধিকার রাখে? আমাদের মতে এ প্রশ্নের জবাব পরিষ্কার। কারণ, ইহুদি জাতি মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নবি বলে স্বীকার করে। কিন্তু ইসা আলাইহিস সালাম এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবি মানে না। অপরদিকে খ্রিষ্টানরা ইসা আলাইহিস সালামকে নবি হিসেবে মানলেও মুসা আলাইহিস

সালাম, দাউদ ও সোলাইমান আলাইহিস সালাম এবং আখেরি নবি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবি বলে স্বীকার করে না। অথচ পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবেই মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইমান আনার বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে মুসলমানগণ উপর্যুক্ত দল দুটির ব্যতিক্রম। তারা মুসা, ইসা ও মুহাম্মদ আলাইহিমুস সালামসহ সকল নবিগণের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপনকারী। সকলকেই নবি বলে তারা স্বীকার করেন। এখানে দুটি বিষয়। একটি হচ্ছে তাওহিদ। অপরটি হলো রেসালাত। অর্থাৎ, সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইমান আনা। যা পূর্বের সকল আসমানি কিতাবের নির্দেশ। এ বিষয়টি একমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই বিদ্যমান। যা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মধ্যে নেই। ফলে আল্লাহর অনুগত বান্দা হওয়ার কারণে মুসলমানগণই একমাত্র পবিত্র মসজিদুল আকসার প্রকৃত ওয়ারিস। তারাই কেবল তাতে নামাজ পড়ার অধিকার রাখে। অন্যদের এই পবিত্র ভূমিতে বালুকণা পরিমাণ কোনো অধিকার নেই। বরং তাদের নাপাক পদচারণা থেকে মসজিদুল আকসার পবিত্রতা রক্ষা করা সময়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দাবি। কাজেই দয়ালু আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে মসজিদুল আকসার পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধার করার তাওফিক দান করেন–এ কামনা ও প্রচেষ্টাই আমাদের করে যেতে হবে অবিরাম।

মুহাদ্দিস, জামি'আ হোসাইনিয়া মদিনাতুল উলুম, তজুমুদ্দিন, ভোলা।

> মানুষ যখন স্বার্থচিন্তায় তাড়িত হয় তখন তার ভিতরের শিশুটি হারিয়ে যায়। তার চোখের চাহনিতে এবং মুখের হাসিতে শিশুর সরলতা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।
>
> *আবু তাহের মিছবাহ হা.*

বাইতুল মাকদিসের মাহাত্ম

মুফতী আইয়ুব নাদীম

হাজারো লড়াই-সংগ্রাম, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মজলুম মসজিদের নাম 'বাইতুল মুকাদ্দাস'। কালের পরিক্রমায় হজরত দাউদ আ. ও তাঁর পুত্র হজরত সুলাইমান আ.-এর হাত ধরে ব্যাপক সংস্কারমূলক কাজের সংযোজনের মাধ্যমে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এই মসজিদ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই মসজিদ মুসলমানদের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নেয় বিশেষভাবে। শত শত নবি-রসুল, সাহাবি ও অসংখ্য বীর-মুজাহিদের স্মৃতিবিজড়িত ও ফজিলতপূর্ণ এই মসজিদের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য নিয়ে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো:

- **যেভাবে বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা হয়েছিল :**

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় থাকাকালীন বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন, কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনা মুনওয়ারায় হিজরত করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'পূর্বে তুমি যে কিবলার অনুসারী ছিলে, আমি তা অন্য কোনো কারণে নয়; বরং কেবল এ কারণে স্থির করেছিলাম যে, আমি দেখতে চাই–কে রসুলের আদেশ মানে, আর কে তার পিছন দিকে ফিরে যায়, সন্দেহ নেই এ বিষয়টা বড় কঠিন, তবে আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন, তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন না।' (সুরা বাকারা : ১১৩) নতুন এই কিবলা গ্রহণ করে নেওয়া যদিও কঠিন ছিল, কিন্তু ঈমানের বলে বলিয়ানরা বিনা বাক্যে তা মেনে নিয়েছিলেন, ওই নির্দেশ মোতাবেক প্রায় সতেরো মাস বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করলেন। বাইতুল্লাহ যেহেতু বাইতুল মুকাদ্দাস অপেক্ষা বেশি প্রাচীন, উপরন্ত তার সাথে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্মৃতি বিজড়িত ছিল, তাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেন বাইতুল্লাহকেই কিবলা বানানো হয়, বাস্তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যে হয়েছিলও তা-ই।

- **কুরআনে বাইতুল মুকাদ্দাস :**

রসুলুল্লাহ সা.-এর ঐতিহাসিক মেরাজ ও মুজেযাপূর্ণ ইমামতির অনন্য সাক্ষী বাইতুল মুকাদ্দাস। যার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য কম-বেশি সবাই জানে। সিরাত ও হাদিসের কিতাবসমূহে বাইতুল মুকাদ্দাসের নানা ফজিলতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর শ্রোতা এবং সবকিছুর জ্ঞাতা।' (সুরা বুনি ইসরাইল : ১)

• বাইতুল মুকাদ্দাসে রাসুলের আগমন ও ইমামতি :

হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাতের বেলা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং তাঁকে একটি জন্তুর পিঠে সওয়ার করালেন। জন্তুটির নাম ছিল বুরাক (বুরাক গাধা হতে বড় এবং খচ্চর হতে ছোট একটি সাদা বর্ণের জীব সদৃশ)। বিদ্যুৎগতিতে তাঁকে মসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলেন। এ ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আনাস বিন মালেক রা. সূত্রে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'আমার জন্য বুরাক প্রেরণ করা হলো, যতদূর পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি যায়, এক পদক্ষেপে সে ততদূর এগিয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, আমি এতে সওয়ার হলাম এবং বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এসে গেলাম। অতঃপর অন্যান্য নবিগণ তাদের বাহনগুলো যে রশি দিয়ে বেঁধেছেন, আমিও আমার বাহনটি সে রশি দিয়ে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলাম, অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করে বের হলাম।' (মুসলিম : ৩০৮)

• বাইতুল মুকাদ্দাসে নামাজের সওয়াব :

পৃথিবীতে অনেক মসজিদ আছে, তবে যেই মসজিদের সম্বন্ধ রাসুলের সাথে হয়, তার সম্মান এমনিতেই বহু গুণে বেড়ে যায়। সেখানে রাসুলুল্লাহ সা. এই মসজিদে নামাজের ফজিলতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, জাবের রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মসজিদুল হারামে এক রাকাত নামাজ এক লাখ রাকাত নামাজের সমান, আমার মসজিদে (মসজিদে নববি) এক নামাজ এক হাজার নামাজের সমান এবং বাইতুল মুকদ্দাসে এক নামাজ ৫০০ নামাজের সমান।' (ইলাউস সুনান : ৫/১৮১)

• বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে হজ ও উমরা :

হজ ও উমরার ফজিলতের কথা কোরআন-সুন্নাহর বিশাল অংশ জুড়ে বর্ণিত হয়েছে, তবে এই হজ ও উমরাহ যদি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে করা হয়, তাহলে তার সওয়াব আরও বেড়ে যায়। এ ব্যাপারে উম্মে সালামাহ রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, 'যে-ব্যক্তি হজ অথবা উমরাহর জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস হতে মসজিদুল হারাম পর্যন্ত গমনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে অথবা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।' (আবু দাউদ : ১৭৪১)

• বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ :

বাইতুল মুকাদ্দাসের আজমত প্রতিটা মুসলমানের হৃদয়ের মণিকোঠায়, তাই এই মসজিদে নামাজ আদায় ও বরকত লাভের উদ্দেশে ভ্রমণ করা প্রতিটা মুমিনেরই দিলের তামান্না। এ ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের দিকে ভ্রমণ করা যাবে না। মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববি) এবং মসজিদুল আকসা।'

সুতরাং প্রতিটি মুমিন-মুসলিমের কর্তব্য, ফিলিস্তিন ও এর অধিবাসীদের প্রতি ভালোবাসা রাখা। বাইতুল মুকাদ্দাস ও তার পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করা। সম্ভব না হলে যেকোনো উপায়ে তাদের সাহায্য করা। তাও সম্ভব না হলে অন্তরে ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা ও সেখানকার মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। এটাই ইমানের দাবি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুহাদ্দিস, জামিয়া কাশেফুল উলুম মাদ্রাসা, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

রুচিশীল সাহিত্য-সাধকের চিন্তা হয়ে থাকে খুবই উন্নত, গভীর ও সুদূর প্রসারী। তিনি উপলব্ধি করেন নির্বাক জড়বস্তুর অভিব্যক্তি এবং তাতে আপ্লুত হন। কখনো অন্যকেও আপ্লুত করেন। (মাও. আবু তাহের মিছবাহ হা.)

গাযার জন্য

দু'ফোঁটা অশ্রুর বারুদ

■ মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী

অশ্রুর অনেক শক্তি আছে আসমানের মালিকের কাছে । তিনি অশ্রুকে ভালোবাসেন । তাকদির পরিবর্তন করেন । পৃথিবীতে মানুষের একান্ত মুহূর্তগুলোতে এ অশ্রু বারুদের কাজ করে । বদরের জায়নামাজে বারুদের কাজ করেছে । ওহুদে করেছে । খন্দকেও করেছে । বারুদ আর অশ্রু কি এক ? বলি-কি, বারুদের চেয়ে অশ্রুর শক্তি ঢের বেশি।

জলপাই উপত্যকার গাজাবাসীর জন্য আমাদের অশ্রুর বারুদ ছাড়া কিছুই করার নেই। এক সময় আমাদের অশ্রুর বারুদ নয় সত্যিকার বারুদ ছিল। গাজা বা ফিলিস্তিনের এ মাটিতে বারুদ হয়ে সর্বপ্রথম এসেছিলেন খলিফা উমর ফারুক। এ মাটিতে আমাদের আরও বারুদ ছিলেন হাত্তিনের যুদ্ধের আইয়ুবি। ইমামুদ্দিন, নুরুদ্দিন, মুহাম্মদ বিন কাসিম। আরও অনেকে। তারা সবাই বারুদ ছিলেন। এসব বারুদে গাজার মাটি পবিত্র হয়েছিল। ফিলিস্তিনে জলপাই বাগানে নেমে এসেছিল স্বর্গীয় আবহ।

রক্ত ও বেদনায় পতিত গাজার ইতিহাস বড়ই নির্মমতার। বড়ই শোকাতুর। প্রায় পাঁচ শতাব্দীকাল অবধি মুসলিম শাসনামল চলা এ ভূখণ্ডে ১০৯৯ সালে খ্রিষ্টান ক্রুসেডার বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দিস আক্রমন করে। ৭০ হাজার মানুষকে হত্যা করে তারা আমাদের প্রিয় এ ঘরের দখল নেয়। ক্রুসেড যুদ্ধের পর খ্রিষ্টানদের অধীনে ফিলিস্তিন শাসিত হয় ৮৮ বছর। ১১৮৭ সালে হাত্তিনের যুদ্ধে সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবি ক্রুসেডারদের পরজিত করেন। ঐতিহাসিক এ বিজয়ের দিনে এ বারুদ আইয়ুবি প্রতিশোধের ঝাঁজ দেখাননি। চূড়ান্ত মানবিকতা দেখিয়েছেন পরাজিত শত্রুর প্রতি।

বিশ শতকের দিকে উসমানি সালতানাতের অধীনে থাকা এ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রে জয়নবাদি ইহুদিরা আবাস গড়তে থাকে। মুসলমানদের উদারতার সুযোগে বলব-মুসলমানদের অলসতার সুযোগে ধীরে ধীরে তারা ফিলিস্তিনে ঢুকে পড়ে। ১৯৭২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস আর্থার বেলফোর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের একটি জাতীয় বাসস্থান প্রতিষ্ঠায় সমর্থন জানান। বিশ্ব ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসেবে গণ্য করা হয় এ ঘোষণাটিকে। ব্রিটিশদের গভীর ষড়যন্ত্রে উসমানি খেলাফতের পতন হলে ১৯২০ সালে ফিলিস্তিনের কর্তৃত্ব লাভ করে ব্রিটিশরা। ফিলিস্তিনে নিযুক্ত হন ইহুদিবাদী প্রথম ব্রিটিশ কমিশনার। তার নাম স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল ১৯২০-২৫।

চরম মুসলিম বিদ্বেষী এ বৃটিশ কমিশনার ফিলিস্তিনের পুরো অঞ্চলকে বিশ্বের নানা প্রান্তে বসবাসকারী ইহুদিদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এরপর থেকেই গাজায় নেমে আসে অপয়া শক্তি। অশুভ এ শক্তির ঘানি তখন থেকে আজো টানছে পৃথিবী। অভিশপ্ত এ ইহুদিরা ১৯৩৩ সালে অ্যাডলফ হিটলারের তাড়ানি খেয়ে জার্মান থেকে পালিয়ে ফিলিস্তিনে চলে আসে। ব্রিটিশ শাসন ও ইহুদিদের অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে ১৯৩৬-১৯৩৯ সালে সংঘটিত হয় আরব সংগ্রাম। সে সময় নিহত হয় পাঁচ হাজার আরব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিন নিয়ে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে সংঘাত বেড়ে যায়। সে সংঘাত থেমে থেমে আজও চলছে। এদিকে বিশ্ব রাজনীতিতে এ ভূখণ্ড নিয়েই বরাবরই খেলে থাকে সব মোড়লরাই।

সে খেলা আজও চলছে। ফিলিস্তিন ভূখণ্ড অবৈধ ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে তাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আজও চলছে। সর্বশেষ এ লড়াইয়ে লাশের মিছিল বেড়েই চলছে। ফুলের মতো শিশুদের রক্ত আর শহীদদের রক্তের ঢেউ ভূমধ্য সাগরের নিল পানিকে রক্তিম করে তুলেছে। এ রক্তিম ঢেউ এখনো আসেনি পাশের লোহিত সাগরের পাড়ে কিংবা এ সাগরের পাড়ে ভোগে মত্ত বিলাসি আরবের হৃদয়ে।

পৃথিবী আর কতদিন বয়ে বেড়াবে এ অভিশাপ। জানা নেই। আর কত কাল পুণ্যভূমি আল কুদুসের জন্য ইসরা ও মিরাজের স্মৃতিধন্য ভূখণ্ডের জন্য তারা লড়ে যাবে জানা নেই। আর লাল ঘোমটায় ঢেকে থাকা আরবীয় শেখরা নবি মুহাম্মদের বারুদের উত্তরাধিকারী বিসর্জন দিয়ে আর কত কাল জয়নবাদিদের সেবাদাস হয়ে থাকবে তাও জানা নেই। উম্মাহর বারুদগুলো ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা ফিলিস্তিনিদের জন্য অশ্রুর বারুদ দিয়ে যেতে চাই। অশ্রুর বারুদই আমাদের শেষ সম্বল। ভোর আসবেই। শীতল বারুদ আবার রক্তিম হয়ে উঠুক পৃথিবীর পুবে পশ্চিমে। সে অপেক্ষায়...।

তত্ত্বাবধায়ক, নবীনকণ্ঠ

মসজিদুল আকসা
মুসলমানদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

■ আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী

আল মসজিদুল আকসা; যাকে আল কুদস, বাইতুল মাকদিস বা বাইতুল মুকাদ্দাসও বলা হয়। প্রায় ১৪ হেক্টর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত আল আকসা কমপ্লেক্স। একক কোনো স্থাপনা নয়। চার দেয়াল বেষ্টিত এ কমপ্লেক্সে মসজিদ, মিনার মেহরাব ইত্যাদি মিলিয়ে ছোট-বড় প্রায় দুইশত ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে। পৃথিবীর বরকতময় ও স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তিনের সুন্দর সুশোভিত প্রাচীনতম জেরুজালেম শহরে অবস্থিত মসজিদে আকসা মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। মুসলিম জাতির প্রথম কিবলা ও পৃথিবীর বুকে অবস্থিত সব জাতি- বর্ণের মুসলমানদের প্রাণস্পন্দন। প্রতিটি ধর্মে কিছু পবিত্র বিষয় ও স্থান আছে, যেগুলোকে তার অনুসারীরা সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে। আর তা রক্ষা করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করে। ইসলাম ধর্মেও এমন কিছু পবিত্র স্থান রয়েছে, যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং সম্মান রক্ষাকে মুসলমানরা তাদের ঈমানি দায়িত্ব মনে করে। মসজিদুল আকসা সেগুলোর একটি। পবিত্র মক্কা ও মদিনার পর মসজিদুল আকসা মুসলমানদের কাছে তৃতীয় পবিত্রতম স্থান।

কোরআনে আল-আকসার বৈশিষ্ট্য :

পবিত্র কোরআনে আল-আকসা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে–

১. পবিত্র ভূমি : আল্লাহ তাআলা মসজিদুল আকসা ও তার আশপাশের অঞ্চলকে পবিত্র ভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, তাতে তোমরা প্রবেশ করো এবং পশ্চাদপসরণ কোরো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ২১)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আয়াতে পবিত্র ভূমি দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্দেশ্য। সেখানে বনি ইসরাইলকে প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

২. বরকতময় ভূমি : মহান আল্লাহ মসজিদুল আকসাসহ সমগ্র ফিলিস্তিন ভূমিকে বরকতময় করেছেন। তিনি বলেন, 'যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হতো, তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৩৭)

৩. মহানবি সা.-এর স্মৃতিধন্য ভূমি : ইসরা ও মিরাজের রাতে আল্লাহরাসুলুল্লাহ সা.-কে মসজিদুল আকসা পরিভ্রমণ করান। ইরশাদ হয়েছে, 'পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা : বনি ইসরাইল, আয়াত : ১)

৪. মুক্তিকামীদের ভূমি : আল্লাহ যুগে যুগে মুক্তিকামী মানুষকে ফিলিস্তিন ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছেন। যেমন-লুত আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এবং আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৭১)

৫. কল্যাণময় রাজ্য ও রাজত্বের ভূমি : আল্লাহ ফিলিস্তিন ভূমিকে কল্যাণময় করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে, 'এবং সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; তা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত।' (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৮১)

৬. মধ্যবর্তী ভূমি : প্রাচীন শামের সঙ্গে আরবরা যে পথগুলো ব্যবহার করত তার মধ্যভাগে ছিল ফিলিস্তিন ভূমি, যাকে আল্লাহ ভ্রমণকারীদের জন্য নিরাপদ করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কোরো দিনে ও রাতে।' (সুরা : সাবা, আয়াত : ১৮)

৭. জলপাই ও ডুমুরের ভূমি : আল্লাহ সুরা ত্বিনে জলপাই, ডুমুর ও সিনাই উপত্যকার শপথ করেছেন, যা স্পষ্টতই ফিলিস্তিন ভূমিকে বোঝায়। ইরশাদ হয়েছে, 'শপথ ত্বিন (জলপাই) ও জাইতুনের (ডুমুরের), শপথ সিনাই পর্বতের।' (সুরা : ত্বিন, আয়াত : ১-২)

হাদিসে আল-আকসার বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কোরআনের মতো হাদিসেও আল-আকসার মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। এর কয়েকটি হলো–

১. যে মসজিদ ভ্রমণে সওয়াব মেলে : হাদিসে সওয়াবের নিয়তে তিনটি মসজিদ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবি সা. বলেছেন, মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসুল (মসজিদে নববি) এবং মসজিদুল আকসা–এই তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশে সফর করা যাবে না। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৮৯)

২. দাজ্জাল থেকে নিরাপদ : আল্লাহ তাআলা মসজিদুল আকসাকে দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা করবেন। হাদিসে এসেছে, 'দাজ্জাল পৃথিবীতে ৪০ দিন অবস্থান করবে। তার রাজত্ব সর্বত্র বিস্তার লাভ করবে। তবে চার মসজিদ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে। তা হলো কাবা, মসজিদে রাসুল, মসজিদুল আকসা ও মসজিদে তুর।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩১৩৯)

৩. এক আমলে হাজার আমলের সওয়াব : মাইমুনা বিনতে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে আমাকে ফতোয়া দিন। তিনি বলেন, এটা হাশরের মাঠ এবং সকলের একত্র হওয়ার ময়দান। তোমরা তাতে নামাজ আদায় করবে। কেননা সেখানে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়া অন্যান্য স্থানের তুলনায় এক হাজার গুণ উত্তম। আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি সেখানে যেতে সমর্থ না হই? তিনি বলেন, তুমি তাতে বাতি জ্বালানোর জন্য জলপাইয়ের তেল হাদিয়া পাঠাও। যে ব্যক্তি তা করল, সে যেন সেখানে উপস্থিত হলো। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৪০৭)

৪. সত্যের পথে সংগ্রামের ভূমি : আল্লাহ ফিলিস্তিন ভূমিকে সত্যের পথে সংগ্রামের দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আমার উম্মতের একটি দল দামেস্কের প্রবেশপথগুলোতে এবং তার আশপাশে সংগ্রাম করতে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বদা (সত্যের পক্ষে) সংগ্রামরত থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের শত্রুরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' (মুসান্নাফে আবি ইয়ালা, হাদিস : ৬৪১৭)

৫. কিয়ামতের আলামত : আল্লাহ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিয়ামতের আলামত বানিয়েছেন। আউফ বিন মালিক রা. বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে আল্লাহর রাসুল সা.-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে ছিলেন। আল্লাহর রাসুল সা. বললেন, কিয়ামতের আগের ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখো- ১. আমার মৃত্যু, ২. বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, ৩. তোমাদের মধ্যে ঘটবে মহামারি, বকরির পালের মতো মহামারি, ৪. সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে ১০০ দিনার দেওয়ার পরও সে অসন্তুষ্ট থাকবে, ৫. এমন এক ফিতনা আসবে, যা আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে, ৬. যুদ্ধবিরতির চুক্তি, যা তোমাদের ও বনি আসফার বা রোমকদের মধ্যে সম্পাদিত হবে। অতঃপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং ৮০টি পতাকা উড়িয়ে তোমাদের বিপক্ষে আসবে; প্রত্যেক পতাকার নিচে থাকবে ১২ হাজার সৈন্য। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩১৭৬) আল্লাহ মুসলিম জাতিকে মসজিদুল আকসার সম্মান রক্ষা করার তাওফিক দিন। আমিন।

মুহাদ্দিস, খতিব ও লেখক

একটি বীজ হয়তো খুব ছোট, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। তুমি ক্ষুদ্রতার কথা ভেবো না, সম্ভাবনার কথা ভাবো।
আবু তাহের মিছবাহ হাফি.

ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত:
সমাধান কোন পথে?

■ আলী ওসমান শেফায়েত

বিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন সংকটের অন্যতম ফিলিস্তিন সংকট। ইহুদি ও মুসলিমের মধ্যে বিরোধপূর্ণ এক আলোচিত যুদ্ধ। এ সংঘাতের ঘটনা আজ নতুন কিছু নয়। বর্তমান যুদ্ধের আগে ২০০৮, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০২১ সালেও ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ হয়েছে। উপরন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরাইল ফিলিস্তিনের অধিকৃত অঞ্চলে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে, বহু এলাকা দখল করে নিয়ে ইহুদি বসতি স্থাপন ও লোক স্থানান্তর করেছে। এ যুদ্ধের বিস্তর ইতিহাস রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর, ব্রিটেন ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ নেয়, যা তখন ইহুদি সংখ্যালঘু এবং আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্রিটেনকে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি আবাসভূমি তৈরি করার দায়িত্ব দেয়, যা মুসলমানদের গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনাকে বাড়িয়েতোলে।

১৯২০ থেকে ১৯৪০ দশকের মধ্যে ইউরোপ থেকে দলে দলে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে যেতে শুরু করে এবং তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ইউরোপে ইহুদি নিপীড়ন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের ভয়ংকর ইহুদি নিধনযজ্ঞের পর সেখান থেকে পালিয়ে এরা নতুন এক মাতৃভূমি তৈরির স্বপ্ন দেখছিল। ফিলিস্তিনে তখনইহুদি আর আরবদের মধ্যে শুরু হয় ব্যাপক সহিংসতা একই সঙ্গে সহিংসতা বাড়ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে এক ভোটাভুটিতে ফিলিস্তিনকে দুই টুকরো করে পৃথক ইহুদি এবং আরব রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়, যেখানে জেরুজালেম থাকবে একটি আন্তর্জাতিক নগরী হিসেবে। ইহুদি নেতারা এই প্রস্তাব মেনে নেন, কিন্তু আরব নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রিটিশরা এই সমস্যার কোনো সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন ছাড়ে এবং ইহুদি নেতারা এরপর ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। বহু ফিলিস্তিনি এর প্রতিবাদ জানালে শুরু হয় যুদ্ধ। হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে তাদের ঘরবাড়ি ফেলে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। ফিলিস্তিনিরা এই ঘটনাকে 'আল নাকবা' বা 'মহা-বিপর্যয়' বলে থাকে। পরের বছর যুদ্ধবিরতির মধ্যদিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়। ততদিনে ফিলিস্তিনের বেশিরভাগ অঞ্চল ইসরাইলের দখলে।

১৯৬৭ সালে আরেকটি আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের পূর্ব-জেরুজালেমসহ বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। ইসরাইল এখন পুরো জেরুজালেম নগরীকেই তাদের রাজধানী ঘোষণা করে। অন্য ফিলিস্তিনিরা পূর্ব-জেরুজালেমকে তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে চায়। জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ হাতে গোনা কয়েকটি দেশ। গত ৫০ বছর ধরেই ইসরাইল এসব দখলিকৃত জায়গায় ইহুদি বসতি স্থাপন করছে। ছয় লাখের বেশি ইহুদি এখন এসব এলাকায় থাকে। ফিলিস্তিনিরা বলছে, আন্তর্জাতিক আইনে এগুলো অবৈধ বসতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়। তবে ইসরাইল তা মনে করে না। ফিলিস্তিনের ইসলামপন্থি সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগঠন হামাস। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ইসরাইলি দখলদারির অবসানের দাবিতে 'ইন্তিফাদা' বা ফিলিস্তিনি গণজাগরণ শুরুর পর ১৯৮৭ সালে হামাস গঠিত হয়। সংগঠনটির সনদ অনুযায়ী তারা ইসরাইলে দখলদারিত্ব থেকে ফিলিস্তিনকেমুক্ত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাদের লক্ষ্য, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হবে বর্তমান ইসরাইল, গাজা ও পশ্চিম তীর নিয়ে গঠিত একক ইসলামি রাষ্ট্র। ইতিহাস বলছে প্রায় আট দশক ধরে সংঘাত চলছে ফিলিস্তিন ও ইসরাইল অঞ্চলে। এই সংঘাত-সহিংসতা ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এ সংঘাত শুধু ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ না থেকে এই ইস্যু নিয়ে বিরোধের হাওয়া-উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে। ইসরাইল-হামাসের চলতি যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বিশ্বব্যাপীই।

তোমার জীবননদীর স্রোত যেন হে বন্ধু! সাগরমুখী হয়, তোমার জীবননদীর স্রোত যেন মরুভূমির বালুসাগরে হারিয়ে না যায় ।

চলতি মাসের ৭ তারিখ ভোরে মুক্তিকামী হামাস যোদ্ধারা অতর্কিতে ইসরাইলে প্রবেশ করে হামলা চালায়। জবাবে গাজায় বোমাবর্ষণ শুরু করে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। ইসরাইলের বিমান হামলায় গাজা শহরের বিভিন্ন এলাকা ধুলোয় মিশে গেছে। হামাসের হামলায় ইসরাইলে অন্তত ১ হাজার ৪০০ এবং গাজায় প্রায় ১০,০০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানাচ্ছে। ইসরাইল সর্বাত্মক অবরোধ আরোপের পাশাপাশি হামলা আরও বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। এ যুদ্ধ নিয়ে উভয় দেশের নেতাদের পাল্টা-পাল্টি সিদ্ধান্তের ঘোষণা ও নিজ নিজ অনঢ় অবস্থানের কথা ব্যক্ত করেছেন। ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, 'দখলদার সন্ত্রাসী ও দখলকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে ফিলিস্তিনি জনগণের'। অপরপ্রান্তে, ইসরাইল যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ৭ই অক্টোবর, ইসরাইলিদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে তিনি বলেন, 'ইসরাইলের জনগণ, আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি। আমরা জিতব।' তিনিবলেন, 'গত শনিবার সকালে ইসরাইল ও ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে মারাত্মক আকস্মিক হামলা চালিয়েছে হামাস। আমরা সকাল থেকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে আছি। 'আমি নিরাপত্তাব্যবস্থার সব প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছি। প্রথমতযারা ইসরাইলে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের নির্মূলের নির্দেশ দিয়েছি, এ অপারেশন এ মুহূর্তে চলছে।' বহু দেশে অসংখ্য মানুষ ফিলিস্তিনদের পক্ষে বিক্ষোভ সমাবেশ করছে। মুসলিম দেশগুলোতে বিক্ষোভকারীদের প্রধান স্লোগান হচ্ছে, 'ইসরাইলের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। বদরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার। বিশ্ব মুসলিম ঐক্য গড়ো, ফিলিস্তিন স্বাধীন করো।'

পশ্চিমা দেশগুলোতেও ইসরাইল ও ফিলিস্তিনদের পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক মিছিল-মিটিং হচ্ছে। রাশিয়া বলেছে, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমাধান। ইইউ ফিলিস্তিনিদের সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে। আমেরিকা ইসরাইলের পক্ষে যুদ্ধাস্ত্র প্রেরণ করেছে। এ যুদ্ধে ইসরাইলকে সামরিক সহায়তা করার তীব্র নিন্দা করেছে রাশিয়া। গত ২৪শে অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের একটি সেশনের উদ্বোধনী বক্তব্যে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, গাজায় আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তাতে সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে ইসরাইল। এ বিষয়ে তিনি গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে আরও পরিষ্কারভাবে বলেন, সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত কোনো পক্ষই আন্তর্জাতিক আইনের উর্ধ্বে নয়। তবে এক্ষেত্রে তিনি ইসরাইলের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিরা ৫৬টি বছর শ্বাসরুদ্ধকর এক দখলদারিত্বের শিকার হচ্ছে। ফলে হামাসের হামলা খালি খালিঘটেনি। এই যুদ্ধে গাজায় বেসামরিক লোকজনকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার এবং গাজার উত্তরাঞ্চলে থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর বোমা হামলার নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। উভয় দেশই এক একটা বৃহৎ ধর্মের মতাদর্শে বিশ্বাসী। ইসরাইল দেশটি ইহুদি অধ্যুষিত এলাকা এবং ফিলিস্তিন দেশটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। ফলে এ যুদ্ধে বর্তমানে উভয় দেশই নিজ নিজ ধর্ম ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মরিয়া। সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত অস্তিত্ব, কালচার, অবস্থান ধরে রাখতে উভয় দেশ শক্ত অবস্থানে। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বে নতুন করে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিয়েছে। ইসরাইলের সমর্থনে পর্যাক্রমে বেশি ইহুদি রাষ্ট্রগুলো এগিয়ে আসছে এবং ফিলিস্তিন সমর্থনেও একইভাবে বেশি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এগিয়ে আসছে।

চলমান ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতে তেল আবিবের পাশে অবস্থান নিয়েছে আমেরিকা, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা অনেক দেশ। তবে এই সংঘাত অবসানে ইসরাইল- ফিলিস্তিন আলাদা দুই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছে চীন। কিন্তু এতে করে বিশ্ব পরিস্থিতি আরও নাজুক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনিতেই বিশ্ব করোনা পরিস্থিতি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ সংক্রান্তে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অবস্থার বেহাল দশা। ফলে নতুন এ যুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্ব অর্থনীতিকে আরও করুণ অবস্থায় নিয়ে যাবে। চলমান এ যুদ্ধ সংক্রান্তে সার্বিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও পশ্চিমা বিশ্বের এগিয়ে আসা উচিত। হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ বা বিরতি দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আরব রাষ্ট্রগুলো, রাশিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ। এ জন্য মঙ্গলবার ফোনে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়া রোধে বৃহত্তর কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে সম্মত হন তারা। ওদিকেইসরাইলি সেনা ও দখলিকৃত পশ্চিমতীরের ফিলিস্তিনিদের মধ্যে লড়াই তীব্র হয়েছে। অশান্ত হয়ে উঠেছে ইসরাইল-লেবানন সীমান্ত। যদি এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তা বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটাবে। হামাসের হাতে জিম্মি ইসরাইলিদের যেহেতু মুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সে জন্য ইসরাইলকে গাজায় স্থল হামলার পরিকল্পনা স্থগিত করার পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত আমির সাইদ ইরাভানি নিরাপত্তা পরিষদে বলেছেন, হামাস-ইসরাইল যুদ্ধে অন্যায়ভাবে ইরানকে দায়ী করার চেষ্টা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেন, দ্ব্যর্থহীনভাবে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পক্ষান্তে আগ্রাসীদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধকে আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ পরিস্থিতি নিরসনে ফিলিস্তিন জনগণের সার্বিক মুক্তি ও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া এ সমস্যা সমাধান হতে পারে না। এছাড়াও জাতিসংঘের ২৪২ এবং ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাবনা অনুসরণ করে দখলমুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের পাশাপাশি অবস্থান এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে পারে। উভয় দেশকেই যুদ্ধ ও সংঘাতের সিদ্ধান্ত পরিহার করে শান্তি আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্বের মোড়ল রাষ্ট্রগুলোকে এ শান্তি আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে। সর্বোপরি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে বিশ্বের মোড়ল রাষ্ট্রগুলোকে কার্যকরী ব্যবস্থাসহ এগিয়ে আসতে হবে।

গবেষক ও কলামিস্ট

দুঃখ তোমার কাছে কেনো এতো অপ্রিয়? জীবনে দুঃখের ছায়াপাত না হলে সুখের মুহূর্তগুলো কি এতো সুখের হতো? (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

আল-আকসার ইতিহাস ও ইহুদিদের আগমন

শেখ মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ

আল আকসা মুসলমানদের কাছে মক্কা-মদিনার পর সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান। এ মসজিদটি ফিলিস্তিনের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র জেরুজালেম নগরীতে অবস্থিত। এ মসজিদ অসংখ্য নবি-রাসুলের স্মৃতিধন্য পুণ্যভূমি এবং মুসলমানদের প্রথম কিবলা। হিজরতের পর দীর্ঘ ১৭ মাস পর্যন্ত মুসলমানরা মসজিদুল আকসার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কুরআনের আয়াত নাজিল করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছানুযায়ী মক্কাকে মুসলমানদের কিবলা নির্ধারণ করে দেন।

মাসজিদুল আকসা-এর নির্মাণঃ

খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে মাসজিদুল আকসা নির্মিত হয়। এ মসজিদ পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদ। আবু জর গিফারি রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিগ্যেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি পুনরায় জিগ্যেস করলাম, অতঃপর কোন মসজিদ? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি জিগ্যেস করলাম, এ দুই মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কত সময়ের পার্থক্য? তিনি বললেন, ৪০ বছর। (বুখারি : ৩৪২৫) এ দুনিয়ার বুকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সর্বপ্রথম ফেরেস্তাদের মাধ্যমে বায়তুল্লাহর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। বায়তুল্লাহ-এর পর নির্মিত হয় সব ধর্মের পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনের মাসজিদুল আকসা। কিন্তু মাসজিদুল আকসা কে নির্মাণ করেন, তা নিয়ে উলামাদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। তবে প্রধান তিনটে মত হলো– প্রথম মত : মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম আ.। দ্বিতীয় মত : নুহ আ.-এর ছেলে সাম। তৃতীয় মত : মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম আ.। এখানে উলামায়ে ইসলাম হজরত আদম আ. মসজিদুল আকসার নির্মাতা হওয়ার মতকে প্রাধান্য দেন। কেননা রাসুলুল্লাহ সা. মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসার নির্মাণকালের পার্থক্য বলেছেন ৪০ বছর। আর নির্ভরযোগ্য মতে, ফেরেস্তাদের নির্মাণের পর হজরত আদম আ.-ই মসজিদুল হারামের নির্মাতা ছিলেন। একটা কথা বলাবাহুল্য, মসজিদুল হারাম যেভাবে সময়ে সময়ে সংস্কার হয়েছে, তেমনিভাবে মাসজিদুল আকসাও পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার হয়েছে। আদম আ.-এর পর খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে ইবরাহিম আ. এ মসজিদের পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে ইসহাক ও ইয়াকুব আ. পবিত্র এই মসজিদের পরিচর্যা করেন। অতঃপর খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে সুলাইমান আ. মাসজিদুল আকসা পুনর্মির্মাণ করেন।

আয়তনঃ

১৪৪ একর ভূমির ওপর আল আকসা কম্পাউন্ড অবস্থিত। যা প্রাচীন জেরুজালেম শহরের ১৬.৬ ভাগের এক ভাগ। আল আকসা কম্পাউন্ড অর্ধ-আয়তাকার। এর পশ্চিম দিক ৯৪১ মিটার, পূর্ব দিক ৪৬২ মিটার, উত্তর দিক ৩১০ মিটার এবং দক্ষিণ দিক ২৮১ মিটার প্রশস্ত। কম্পাউন্ডের ভেতরে মাসজিদুল আকসা ছাড়াও একাধিক ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে। যেমন, সোনালি বর্ণের কুব্বাতুস সাখরা। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ৭২ হিজরিতে এটি নির্মাণ করেন। এর পাশেই কিবলি মসজিদ নির্মাণ করেন খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক। কিবলি মসজিদ নির্মাণ করতে ১০ বছর (৮৬-৯৬ হি.) সময় লেগেছিল। কুব্বাতুস সাখরা মূল অবয়বে টিকে থাকলেও কিবলি মসজিদ ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের কারণে একাধিকবার পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল। মাসজিদুল আকসার কম্পাউন্ডে ছোট-বড় ২০০ স্থাপনা রয়েছে। যার মধ্যে আছে মসজিদ, গম্বুজ, আঙিনা, মিহরাব, মিম্বর, আজানের স্থান, কূপ ইত্যাদি। এসব স্থাপনার মধ্যে কুব্বাতুস সাখরার অবস্থান আল আকসা কম্পাউন্ডের ঠিক মধ্যখানে। কিবলি মসজিদের অবস্থান দক্ষিণ পার্শ্বে। এ মসজিদের সাতটি আঙিনা ও বারান্দা রয়েছে। প্রবেশপথ ছয়টি। ২৫টি সুপেয় পানির কূপ। বেশ কয়েকটি পানির ফোয়ারা। সবচেয়ে সুন্দর ফোয়ারা হলো, পাথর আচ্ছাদিত কায়েতবাই ফোয়ারা। বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় পাঠদানের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা ৪০টি উঁচু আসন। এখানে বসেই তারা পাঠদান করতেন।

বিবেক যদি জীবন্ত থাকে, তাহলে তুমি জীবন্ত মানুষ; বিবেক যদি মরে যায় তাহলে তুমি বেঁচে থেকেও তুমি মৃত! (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

মুসলমানদের শাসনায়ত্তে আল আকসাঃ

১৫ হিজরি মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-এর নেতৃত্বে জেরুজালেম বিজিত হয়। তখন তাঁর সাথে ছিলেন, সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস, খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আবু জর গিফারি রা.-সহ সাহাবিদের একটি দল। জেরুজালেম দীর্ঘ অবরোধের মধ্য দিয়ে পার করলেও তার তৎকালীন শাসক সোফ্রোনিয়াস আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-এর হাতে শহর সমর্পণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সে শর্ত দেয় যে, স্বয়ং খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর রা. জেরুজালেম গেলে, সে তার শহর ওমর রা.-এর হাতে সমর্পণ করবে এবং নিজেও আত্মসমর্পণ করবে। অতঃপর আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. ওমর রা.-এর কাছে এ মর্মে পত্র পাঠানোর পর অর্ধ জাহানের শাসক ওমর রা. খুব সাদাসিধেভাবে একজন গেলাম ও একটি উট নিয়ে জেরুজালেমে প্রবেশে করেন। তারপর সোফ্রোনিয়াস খলিফার হাতে শহর সমর্পণ করেন। সে সময় ওমর রা. সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে আল আকসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি নিজে উপস্থিত থেকে পবিত্র পাথর ও আল আকসার আঙিনা পরিষ্কার করে তার দক্ষিণ পার্শ্বে ছোট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। যার নাম মসজিদে ওমর রা. (সড়ংয়ঁব ড়ভ ঙসধৎ রহ ঔবৎঁংধষবস) ওমর রা.-এর এ মসজিদটি আজও গীর্জা সংলগ্ন রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনের পর থেকে মুসলমানের প্রথম কিবলা বায়তুল মাকদিস মুসলমানদের অধীনে পুরোপুরিভাবে চলে আসে।

ইসলামি শাসকদের হাত ধরে আল-আকসার পথ চলাঃ

খোলাফায়ে রাশেদার পর উমাইয়া শাসনের সূচনা হয়। উমাইয়া শাসকদের রাজধানী ছিল দামেস্ক। দামেস্ক ফিলিস্তিনের নিকটবর্তী হওয়ায় উমাইয়া খলিফারা আল আকসাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁদের সময়ে আল আকসার মৌলিক অবকাঠামোগত বহু উন্নয়ন হয়। উমাইয়াদের পর আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনাধীন হয় আল আকসা। কিন্তু তাঁদের রাজধানী বাগদাদ হওয়ায় মসজিদুল আকসার ব্যাপারে তাঁদের মনোযোগ অনেকটাই কমে গিয়েছিল। তবে তাঁরা

প্রয়োজনীয় সংস্কার ও স্থানীয় ধর্মীয় কর্মকাণ্ডগুলোতে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে রামাল্লার যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহিনী মিসরের ফাতেমি বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। সে পরাজয়ের মধ্য দিয়েই ফিলিস্তিনের পরাজয় শুরু হয়। ফাতেমিরা ছিল শিয়া ইসমাইলিয়া মতবাদের অনুসারী। যাদের মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে ইসলামের মধ্যকার মতানৈক্য রয়েছে। ফাতেমীয় শাসকরা মসজিদুল আকসার ওপর নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং ফিলিস্তিন ভূমিতে ইসলামি শিক্ষাধারা বন্ধ করে শিয়া মতবাদ প্রচারের সুযোগ করে দেয়। ফাতেমীয় শাসক হাকিমের শাসনামলের শেষভাগে ১০২১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আল- কুদস ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় তার অতীত ঐতিহ্যের সবটুকু হারিয়ে ফেলে।

১০৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিন সেলজুকদের শাসনাধীন হয়। তারা ছিল সুন্নিমতবাদে বিশ্বাসী। ফলে আল আকসা তার হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে শুরু করে এবং ফিলিস্তিনে আবারও বিশুদ্ধ ইসলামি জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। ধারণা করা হয়, ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে আল আকসায় ইমাম গাজালি রহ.-এর আগমন ঘটে এবং তিনি সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করেন। কিন্তু এই সুদিন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা আল আকসা দখল করে। তারা মসজিদুল আকসাসহ ইসলামি ঐতিহ্যগুলো ধ্বংস করতে তৎপর হয়। ১১৮০ খ্রিস্টাব্দে মিসরের শাসক মুসলিম বীর সেনানী সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. ক্রুসেডারদের হাত থেকে ফিলিস্তিন ভূমি মুক্ত করেন। তখন তিনি ক্রুসেডারদের চাটুকারিতা করা বহু নামধারী আলেমকে হত্যা করেছিলেন। যারা পবিত্র কুদস-কে ক্রুসেডারদের কাছে মুসলমানদের তথ্য পাচার করত। বিজয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে মসজিদুল আকসা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। পরবর্তী জুমা থেকে সেখানে নামাজ শুরু হয়। তিনি নিজ হাতে গোলাপজল দিয়ে আল আকসা পরিষ্কার করেন। বিজয়ের প্রতীক হিসেবে একটি মিম্বর তৈরি করেন এবং এ ছাড়া আল আকসা কম্পাউন্ডের ভেতর একাধিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ. ও তাঁর বংশধররা একাধিকবার ক্রুসেডারদের আক্রমণ থেকে ফিলিস্তিন ভূমিকে রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে মামলুকরা আইয়ুবীয়দের উত্তরাধিকারী হলে তারা আল আকসার নিরাপত্তায় আত্মনিয়োগ করে। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিন ভূমি উসমানীয় শাসকদের নিয়ন্ত্রণে আসে, যা ১৯১৭ সাল পর্যন্ত অটুট ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের মাধ্যমে পবিত্র এই ভূমির নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ব্রিটেনের হাতে। ফলে ফিলিস্তিনে দীর্ঘ মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

ইহুদিদের আগমন ও আক্রমণঃ

ফিলিস্তিনিরা ইহুদি ইসরাইলিদের আক্রমণের শিকার আজ নতুন করে নয়। বরং তা অনেক আগে থেকে চলে আসছে।

ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন অনেকে। এই দুই সম্প্রদায়ের সংঘাতের বীজ বোনা হ য়েছিল এক শতাব্দীরও বেশি সময় আগে পরিচালিত একটি ঔপনিবেশিক

কর্মে। ১০০ বছরেরও বেশি সময় আগে ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আর্থার বেলফোর ব্রিটিশ ইহুদি সম্প্রদায়ের একজন সদস্য লিওনেল ওয়াল্টার রথচাইল্ডকে সম্বোধন করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি ছিল মাত্র ৬৭ শব্দের। কিন্তু এর তাৎপর্য এত বেশি, তা এখনো ধারণ করতে হচ্ছে পৃথিবীকে। এই চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারকে 'ইহুদি জনগণের জন্য ফিলিস্তিনে একটি জাতীয় বাসস্থান প্রতিষ্ঠা' ও তার 'অর্জন' সহজতর করার কথা উল্লেখ ছিল। আর এই চিঠিটিই বেলফোর ঘোষণা নামে পরিচিত। সে-সময় ফিলিস্তিনে আরব স্থানীয় জনসংখ্যা ছিল ৯০ শতাংশেরও বেশি। ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে একটি ব্রিটিশ আদেশপত্র অথবা ম্যান্ডেট ১৯২৩ সালে তৈরি করা হয়েছিল। স্থায়ী হয়েছিল ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। এ সময় ইহুদি অভিবাসনকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল ব্রিটিশরা।

তোমার জীবন যদি তোমার একার হয় তাহলে তুমি ব্যর্থ। তোমার জীবন যদি সবার হয় তাহলে তুমি সফল। তোমার বেঁচে থাকা স্বার্থক। (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

ইউরোপে নাৎসিবাদের অত্যাচার থেকে পালাতেও অনেকে ফিলিস্তিনে আশ্রয় নিয়েছিল। সে সময় থেকে শুরু হয়েছিল ফিলিস্তিনি মুসলমানের মধ্যে বিদ্রোহের দহন। কিন্তু সামর্থ্য আর শক্তি দিয়ে পেরে ওঠেনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা আরব বিদ্রোহের সূচনা করেছিল। স্থায়ী হয়েছিল ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে নবগঠিত আরব জাতীয় কমিটি ফিলিস্তিনিদের ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও ক্রমবর্ধমান ইহুদি অভিবাসনের প্রতিবাদে ট্যাক্স প্রদান বন্ধ ও ইহুদি পণ্য বয়কটের মাধ্যমে একটি সাধারণ ধর্মঘট শুরু করার আহ্বান জানায়। এ ধরনের ধর্মঘট ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। তবে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল ব্রিটিশদের দ্বারা। গণগ্রেফতার অভিযান থেকে শুরু করে বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছিল।

বিদ্রোহের দ্বিতীয়পর্ব শুরু হয়েছিল ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে। ব্রিটিশ বাহিনী ও উপনিবেশবাদকে লক্ষ্য করে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল ফিলিস্তিনি কৃষক। ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটেন ফিলিস্তিনে ৩০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেছিল। সে সময় ফিলিস্তিনের গ্রামগুলোতে বিমান বোমাবর্ষণ, কারফিউ জারি করা, বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া অব্যাহত ছিল। ব্রিটিশরা ইহুদি বসতি স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে সশস্ত্র দলও গঠন করেছিল সে সময়। ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন ইহুদি যোদ্ধাদের নিয়ে একটি 'বিদ্রোহ দমন বাহিনী' গঠন করেছিল, যার নাম ছিল স্পেশাল নাইট স্কোয়াড। বিদ্রোহের সেই তিন বছরের মধ্যে পাঁচ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল। আহতের সংখ্যা ছিল ১৫ থেকে ২০ হাজার। বন্দি করা হয়েছিল পাঁচ হাজার ৬০০ ফিলিস্তিনিকে। ১৯৪৭ সালের মধ্যে ফিলিস্তিনে ইহুদি জনসংখ্যা ৩৩ শতাংশে পৌঁছে যায়। সে সময় তারা ৬ শতাংশ জমির মালিক ছিল। ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদি রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে জাতিসংঘে ১৮১ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফিলিস্তিনিরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল সে সময়। কারণ প্রস্তাবটিতে ফিলিস্তিনের প্রায় ৫৬ শতাংশ ইহুদিদের জন্য বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে বেশির ভাগ উর্বর উপকূলীয় অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় দেশটির ৯৪ শতাংশের মালিক ছিল ফিলিস্তিনিরা। আর জনসংখ্যা ছিল ৬৭ শতাংশ। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অথবা আদেশপত্র শেষ হওয়ার আগেই ইহুদি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণে ফিলিস্তিনি শহর ও গ্রাম ধ্বংস করতে একটি সামরিক অভিযান শুরু করেছিল। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে জেরুজালেমের উপকণ্ঠে দেইর ইয়াসিন গ্রামে ১০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ৫০০টিরও বেশি ফিলিস্তিনি গ্রাম-শহর ধ্বংস করা হয়েছিল। যাকে ফিলিস্তিনিরা আরবি ভাষায় 'নাকবা অথবা বিপর্যয় হিসাবে উল্লেখ করে। গণহত্যায় কমপক্ষে ১৫ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিলেন। ইহুদিরা সে সময় ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশ দখল করেছিল। আর অবশিষ্ট ২২ শতাংশ বর্তমানে অধিকৃত পশ্চিম তীর ও অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা।

১৯৪৮ সালের ১৫ই মে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। এর পরই শুরু হয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে ইসরাইল, মিসর, লেবানন, জর্ডান ও সিরিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে তা শেষ হয়। ১৯৬৭ সালের ৫ই জুন আরব সেনাবাহিনীর একটি জোটের বিরুদ্ধে ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইল গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম, সিরিয়ার গোলান হাইটস ও মিশরের সিনাই উপদ্বীপসহ ফিলিস্তিনের বাকি অংশ দখল করে। এটি ফিলিস্তিনিদের জন্য দ্বিতীয় জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি বা নাকসা নামে পরিচিত। সে সময় অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায়ও বসতি স্থাপন শুরু

১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে গাজা উপত্যকায় প্রথম ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা শুরু হয়। সে সময় ইসরাইলের একটি ট্রাক ফিলিস্তিনি শ্রমিক বহনকারী দুটি ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে চার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল।

তরুণ ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের সেনাবাহিনীর ট্যাংক ও সৈন্যদের দিকে ঢিল ছুড়লে দ্রুত পশ্চিম তীরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ইন্তিফাদা প্রাথমিকভাবে তরুণদের দ্বারা পরিচালনা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই বিদ্রোহে অংশ নেয়

ইউনিফাইড ন্যাশনাল লিডারশিপ। ১৯৮৮ সালে আরবলীগ প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে (পিএলও)

ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ইন্তিফাদা কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে জনপ্রিয় সংহতি, গণবিক্ষোভ, আইন অমান্য, সুসংগঠিত ধর্মঘট ও সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা। ইসরাইলের মানবাধিকার সংস্থা বিতেসেলেমের মতে, ইন্তিফাদার সময় ইসরাইলি বাহিনীর হাতে এক হাজার ৭০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে শিশু ছিল ২৩৭ জন। গ্রেফতার করা হয়েছিল এক লাখ ৭৫ হাজারেরও বেশি মানুষকে। ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তি স্বাক্ষর ও প্যালেস্টাইন অথরিটি (পিএ) গঠনের মাধ্যমে শেষ হয় ইন্তিফাদা। পিএ চুক্তি ইসরাইলকে পশ্চিম তীরের ৬০ শতাংশ ও ভূখণ্ডের ভূমি ও পানি সম্পদের বেশির ভাগ নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শুরু হয় ২০০০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে। সে সময় লিকুদ বিরোধী নেতা এরিয়েল শ্যারন জেরুজালেমের পুরাতন শহর ও তার আশপাশে হাজার হাজার নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে আল আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে সফর করেছিলেন। ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারী ও ইসরাইলের মধ্যে সংঘর্ষে দুদিনে পাঁচজন ফিলিস্তিনি নিহত হয় এবং ২০০ জন আহত হয়েছিল। ঘটনাটি একটি ব্যাপক বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল। ইন্তিফাদার সময় ইসরাইল ফিলিস্তিনি অর্থনীতি ও অবকাঠামোর নজিরবিহীন ক্ষতি করেছে। পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত ২০০৪ সালে মারা যান। তার এক বছর পর দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শেষ হয়। সে সময় ফিলিস্তিনিরা প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেয়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় হামাস। ২০০৭ সালের জুনে হামাসের ওপর 'সন্ত্রাসবাদের' অভিযোগ এনে গাজা উপত্যকায় স্থল, বিমান ও নৌ অবরোধ আরোপ করে ইসরাইল। তারপর গাজায় ২০০৮, ২০১২, ২০১৪ ও ২০২১ সালে চারটি দীর্ঘস্থায়ী সামরিক হামলা করেছে ইসরাইল। হামলায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত ও কয়েক হাজার বাড়ি, স্কুল ও অফিস ভবন ধ্বংস হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালে এসেও জমিদার ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল গোষ্ঠী। একসময় পুরো বিশ্ব থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা আজ নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করতে অবলম্বন করছে নানান কৌশল। আল্লাহ এ লানত প্রাপ্ত ইহুদিদের ধ্বংস করে আবার সে পুণ্যভূমি মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দিন। আমিন।

মুহাদ্দিস, হালিমাতুস সাদিয়া কওমি মাদ্রাসা, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

মানুষ যখন স্বার্থচিন্তায় তাড়িত হয় তখন তার ভিতরের শিশুটি হারিয়ে যায়। তার চোখের চাহনিতে এবং মুখের হাসিতে শিশুর সরলতা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

(মাও. আবু তাহের মিছবাহ হা.)

আকসার আঙিনায়

আব্দুল কাদির ফারুক

জেরুজালেম। আল-কুদস। আল-আকসা। বাইতুল মাকদিস। বাইতুল মুকাদ্দাস। যা-ই বলি আর লিখি, প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ মাধুর্যতায় ভরপুর। এই মসজিদ আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের চেতনা-প্রেরণার বাতিঘর। মুসলমানদের ভালোবাসার শহর। হৃদয়ের স্পন্দন। অসংখ্য নবির পুণ্যভূমি। জন্মভূমি। হাজারো নবি রাসুলের পদধূলির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আছে আমার নবিরও পদধূলি আকসার আঙিনায়। মিশে আছে মেরাজ রজনির অম্লান স্মৃতি। যখানে আমার প্রিয়নবি নামাজের ইমামতির মাধ্যমে ইমামুল মুরসালিন ও সায়্যিদুল মুরসালিনের উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এই আকসা নবিদের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যভূমি। মানসপটে ভেসে ওঠে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের এক অমর কাহিনি, যা আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দিয়ে আসছে, কিন্তু এখন স্মরণেই হৃদয়খান বধুর হয়ে যায়। ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে ওঠে, যখন অনুভব করি এই শহর এখন ইহুদিদের কবজায়। তাদের করায়ত্তে। ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু ইহুদিরা আমাদের প্রিয় মসজিদ আল-আকসাকে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করছে। ১৪ লাখ ৪০ হাজার বর্গমিটারজুড়ে মসজিদুল আকসার চৌহদ্দি। চৌহদ্দির ভেতরের পুরেঅংশটাই হারাম শরিফ। পবিত্র ভূমি। এর যেকোনো জায়গায় এক রাকাত নামাজ আদায় করা হাজার রাকাত সমতুল্য। মসজিদুল আকসা চারদিক থেকে দেয়ালবেষ্টিত। এর ভেতরে অনেক অনিন্দ্য সুন্দর স্থাপনা রয়েছে। আছে স্বতন্ত্র দুটি গম্বুজওয়ালা মসজিদ। একটি সোনালি, অন্যটি কালো। সোনালি গম্বুজটির নাম 'কুব্বাতুস সাখরা' আর কালো গম্বুজটির নাম 'আল জামিউল কিবালি'। আকসার মূল মসজিদ হিসেবে একে ধরে নেওয়া হয়। আর এটাকে হজরত ওমর ফারুক রাযি. নির্মাণ করেছেন। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর মাধ্যমে করতলগত হয় আমাদের প্রিয় বাইতুল মাকদিস। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের রাহবর ইফতেখারুদ্দৌলার সকল প্রতিরোধব্যূহকে ভেঙে আল-কুদসকে ক্রুসেডাররা দখল করে নেয়। চালায় জুলুম নির্যাতনের স্টিমরোলার। প্রয়োগ করে তাদের কুৎসিত কর্মসূচি।

অবশেষে বীর সিপাহসালার সালাহউদ্দিন আইয়ুবির প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ও জোড়ালো যুদ্ধের মাধ্যমে ১১৮৭ সালে, প্রায় নব্বই বছর পর আমরা আবারও ফিরেপাই আমাদের প্রিয় বাইতুল মাকদিসকে, কিন্তু ১৯১৭ সালে আবারও এই অঞ্চলে জুলুম জিল্লতের সূচনা হয় এবং ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি খেলাফতের বিলুপ্তি ঘটে। আর এভাবেই তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ পর্যন্ত আমরা কোমরসোজা করে দাঁড়াতে পারিনি। ইতিহাসের বোবাকান্না আমাদের আড়ষ্টভাবে জড়িয়ে নিয়েছে। কোনোভাবেই সেখান থেকে বের হতে পারছি না। মসজিদুল আকসা হলো মুসলমানদের প্রথম কিবলা। যার দিকে মুখ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম দশ বছর নামাজ আদায় করেছেন। ফিলিস্তিন ভূমি মুসলমানদের কাছে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইসলামি ইতিহাসের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ। ইসলাম আগমনের আগে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বসবাস করতেন তৎকালীন আসমানি ধর্মের অনুসারীরা। হজরত ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, মুসা, দাউদ, সুলাইমান ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের ধর্মের অনুসারীরা এই ভূমিতে বসবাস করতেন। এছাড়া আরও অনেক নবির আবাস্থল ছিল ফিলিস্তিন। মুসলিমদের সকল মাজহাব এই ব্যাপারে ঐকমত্য, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং ফিলিস্তিনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অনেক উচ্চতায়। এর সংরক্ষণ, পবিত্রতা রক্ষা করা শুধু ফিলিস্তিনিদের নয়; বরং সব মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে ফিলিস্তিনের অসংখ্য ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় ফিলিস্তিনের নির্যাতন, নিপীড়ন, গণহত্যার চাক্ষুষ বিবরণ যেমন বিদ্যমান, তেমনিভাবে তাদের মর্যাদার বিবরণ হাদিসের পাতায় বহমান। আজ এমনই কয়েকটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি, যাতে নিকষ অন্ধকারেও আশার আলো ফোটাবে।

১. হজরত আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করা যাবে না। মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদুল আকসা। [মুসলিম শরিফ, হাদিস নম্বর : ৮২৭]

২. আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে। দুর্ভিক্ষ ছাড়া কোনো বিরোধী পক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহর আদেশ তথা কেয়ামত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা কোথায় থাকবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তারা বায়তুল মাকদিস এবং তার আশপাশে থাকবে। [মুসনাদে আহমদ, হাদিস নম্বর : ২১২৮৬]

৩. মাইমুনা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে কিছু বলুন; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বায়তুল মাকদিস হলো হাশরের ময়দান। একত্রিত ও পুনরুত্থানের জায়গা। তোমরা তাতে গিয়ে সালাত আদায় করো। কেননা, তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায়ের সওয়ার পাওয়া যায়। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি মসজিদুল আকসাতে গমনের শক্তি-সামর্থ্য রাখেন না তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন, সে যেন সেখানে মসজিদে বাতি জ্বালানোর তেল-খরচ হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। কেননা যে বায়তুল মাকদিসের জন্য হাদিয়া প্রেরণ করে, সে তাতে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির মতো সওয়ার লাভ করবে। [মুসনাদে আহমদ, হাদিস নম্বর : ২৬৩৪৩]

৪. উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদে হারামে হজকিংবা ওমরা পালনে গমন করবে, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে,কিংবা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। [সুনানে আবু দাউদ : ১৪৭৯]
উপসংহার : ১৯৬৯ সালে এক ইহুদি আকসার একপাশে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে আকসারপূর্বপাশ পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার ডাইরিতে লিখেছিল, 'ওই দিন সারারাত আমার ঘুম হয়নি। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আজকে ইসরায়েলের শেষ দিন। এখনই আরবরা চতুর্দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু যখন ভোর হলো এবং আমার কোনো আশঙ্কাই বাস্তব হলো না, তখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, এখন থেকে ইসরাইল নিরাপদ। আরবরা এখন ঘুমন্ত জাতি। আমরা তাদের এই ঘুম আর ভাঙতে দেবো না।' এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হলো; আমরা এখন ঘুমন্ত এক জাতি। আমরা আমাদের চেতনা ও ঐতিহ্যকে ভুলে নিথর দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি। আর ওরা আমাদের চেতনার ঐতিহ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ওরা এখন মাঠের খেলোয়াড় আর আমরা খেলার দর্শক হিসেবে পৃথিবীতে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছি।

শিক্ষক ও লেখক

মানুষ যখন মানুষের ব্যথা বোঝে, মানুষের বিপদে মানুষ যখন পাশে দাঁড়ায়, যখন মানুষ মানুষের জন্য হাসে এবং কাঁদে, আকাশের ফিরেশতারা তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। (আবু তাহের মিছবাহ হাঃ)

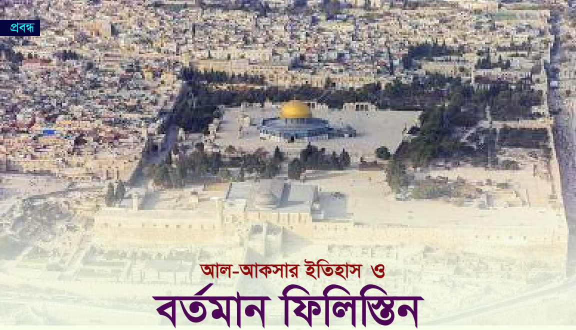

আল-আকসার ইতিহাস ও বর্তমান ফিলিস্তিন

■ **ইমরান হুসাইন**

জেরুজালেম। শত সহস্র মানুষের রক্তে আঁকা জেরুজালেম। পাহাড়ে ঘেরা এ পবিত্র শহরটি হাজারো ইতিহাস ধারণ করে আছে। একইসাথে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের ইবাদতগাহ আছে এখানে। উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত চার্চ অব দ্য হলি সেপালচার খ্রিষ্টান্দের পবিত্র স্থান। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত টেম্পল মাউন্ট ও ওয়েস্টার্ন দেয়াল ইহুদিদের পবিত্র স্থান। আর উত্তর-পুর্ব কোণে অবস্থিত আল আকসা ও কুব্বাতুস সাখরা মুসলিমদের পবিত্র স্থান। হাজার বছর ধরে এর হাতবদল হয়ে আসছে। প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা এ স্থান তাদের বলে দাবি করছে। এ জন্য তারা যুদ্ধ করছে। প্রশ্ন ওঠে, জেরুজালেম আসলে কার? এটা জানতে হলে আমাদের এর ইতিহাস জানতে হবে। হজরত আদম আ. ও তার ছেলে ইসহাক আ. আল-আকসার ভিত্তি গাড়েন। পরবর্তী সময়ে তালুদের অধীনে হজরত দাউদ আ. ফিলিস্তিন দখল করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শাসন করেন। তাঁর পর হজরত সুলাইমান আ. আসনে সমাসীন হন। তিনি জিনদের মাধ্যমে এর পুনঃনির্মাণ করেন। তাঁর জাতি বনি ইসরাইল (ইহুদি জাতি) তখন বেশ শান্তিতে জেরুজালেমে বাস করছিল। সে যুগকে ইহুদিদের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তারা তখন ছিলেন সত্য নবির অনুসারী। এক আল্লাহর ইবাদত করতো। একসময় তারা নবিদের অমান্য করতে লাগল, এমনকি তারা নবিদের হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করল না। আল্লাহ তাআলা তাদের পাকড়াও করলেন। তাদের থেকে জেরুজালেমের ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। তাদেরকে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করলেন। অভিসম্পাত করলেন।

হজরত ইসা আ. জেরুজালেমে আসলেন। হাওয়াজিনরা তার অনুসারী ছিল। আল্লাহ তাদেরকেও সম্মানিত করেছেন। পরবর্তী সময়ে তারা ইসা আ. সম্পর্কে ভুল আকিদা পোষণ করে গোমরাহ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাদের থেকেও জেরুজালেমের শাসন ছিনিয়ে নেন। মুসলমানদের দান করেন। এক নিমিষেই রোমানদের ৬০০ বছরের অহংকার দূরীভূত হয়। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয়, জেরুজালেম একত্ববাদদের। যারা একত্ববাদে বিশ্বাসী তারা কেবল এর প্রকৃত মালিক। তাই ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা যতদিন মুমিন ছিল, ততদিন তাদের ছিল। এখন মুসলমানরা এর মালিক হবে।

১৫ হিজরি মোতাবেক ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ। খেলাফতের আসনে হজরত ওমর ফারুক রাযি.। তিনি অত্যন্ত প্রতাপের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। তার খেলাফতকালের সিরিয়া ও ফিলিস্তিন মুসলমানদের অধীনে আসে। মুসলিম সেনানায়ক আমিনুল উম্মাহ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি. অবরোধ করেন। পবিত্র ভূমিতে রক্তপাত এড়াতে এ কসরত। চার মাস পর তা বাস্তবে রূপ নেয়। সফ্রেনিয়াস (জেরুজালেম শাসক) বাধ্য হয় সন্ধিচুক্তি করতে। হজরত ওমর ফারক রাযি. এই ঐতিহাসিক চুক্তির স্বাক্ষর করেন। রক্তপাতহীন মুসলমানদের প্রথম জেরুজালেম বিজয় ঐতিহাসিকদের হতবিহ্বল করেছে। মুসলমানরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জেরুজালেম শাসন করতে লাগলো।

ইউরোপে ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় উরবান অলীক কিছু কারণ উত্থাপন করে ক্রুসেডের সূত্রপাত ঘটায়। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সহায়তা চায়। সাধারণ জনতাদেরও এ যুদ্ধে শরিক হতে উদ্বুদ্ধ করে। জেরুজালেম তাদের দাবি করে আগ্রাসি আক্রমণ চালায়। তীব্র অবরোধের কবলে পড়ে মুসলিমরা বাইতুল মুকাদ্দাস হারায়। এরপর শহরে প্রবেশ করে ক্রুসেডাররা নির্বিচারে হত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। দেখিয়ে দেয় তাদের আসল রূপ। ক্রুসেড বাহিনীর অধিনায়ক গডফ্রে পোপের কাছে এ মর্মে চিঠি লেখে, আপনি যদি জানতে চান বন্দিদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে, তাহলে এতটুকু জেনে নিন, আমাদের সৈন্যরা রক্তের গভীর স্রোত পার হয়ে সোলাইমান মন্দিরে (বাইতুল মুকাদ্দাস) পৌঁছেছে। এমনকি রক্তে ঘোড়াগুলোর উরু পর্যন্ত ডুবে গেছে। ৯০ বছর পর সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবির মাধ্যমে জেরুজালেম আবার মুসলমানদের হাতে আসে। এরপর তারা আরও ক্রুসেড আক্রমণ চালায়। কিন্তু আর বিজয়ের মুখ দেখতে পায়নি। এরপর জেরুজালেম ওসমানি খেলাফতের অধীনে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানি খেলাফতের পতন হলে মিত্র শক্তিদের হাতে আসে ফিলিস্তিন। এদিকে ইহুদিরা নিজেদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তৎপরতা চালায়। তাদের অধিকাংশের আকাঙ্ক্ষা ছিল ফিলিস্তিন হবে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের স্বপক্ষে দাবি হলো, তাদের উত্তরসূরি এখানেই ছিল, তাই ফিলিস্তিন তাদের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেমস বেলফোর একটি চিঠি লেখেন ব্রিটিশ ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা ব্যারন রথ চাইল্ড-এর কাছে। যেন তিনি ইহুদিদের সংস্থা জায়নিস্ট ফেডারেশন অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড-এর কাছে চিঠিটি পাঠান।

মাত্র ৬৭ শব্দের মূল চিঠিটি একটি জাতির স্বপ্ন ভেঙে দেয়। চিঠিটি খুব ছোট হলেও এটি ইতিহাসের এক দীর্ঘকালীন মানবিক সংকটের প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল। এই ঘোষণা মধ্যপ্রাচ্যের ওই অঞ্চলের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বেলফোর ঘোষণাই ফিলিস্তিন-ইসরাইল জাতিগত সংঘাতের দ্বার উন্মোচন করে। এক সপ্তাহ পর ৯ই নভেম্বর ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করা হয়। এরপর ইহুদিরা নানান কারসাজি করতে থাকে। ফলে ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর ইহুদি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘে ভোটাভুটি হয়। ৩৩ রাষ্ট্র পক্ষে, ১৩ রাষ্ট্র বিরুদ্ধে এবং ১০ রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। প্রস্তাব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ হয়েও ইহুদিরা পায় ভূমির ৫৭% ফিলিস্তিনিরা পায় ৪৩%। জাতিসংঘের মাধ্যমে এভাবেই পাশ হয় একটি অযৌক্তিক ও অবৈধ প্রস্তাব। মূল বেলফোর ঘোষণাটির বঙ্গানুবাদ এরকম : 'মহামান্য সরকার ইহুদি জনগণের জন্য ফিলিস্তিনে জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এবং এ উদ্দেশ্য পূরণে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করা হচ্ছে যে, এমন কিছু করা হবে না, যার ফলে ফিলিস্তিনে অবস্থানরত অ-ইহুদি সম্প্রদায়ের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার অথবা অন্য কোনো দেশে ইহুদিরা যে অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করছে, তার কোনো হানি হয়।' এরপর হাজার হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করে। তারা ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করতে হত্যা সন্ত্রাসের পাশাপাশি ফোন লাইন কেটে দেয়। বিদ্যু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। জোর-জবরদস্তি জমি দখল করে। নারী নির্যাতন করে মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করে। যা তারা বর্তমানেও করছে। আরবরা তাদের বিরুদ্ধে ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৭৩ ও ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে চারবার যুদ্ধ করে। কিন্তু ক্ষতি বৈ লাভের কিছু হয়নি। এর অনেক কারণ ছিল, তার মধ্যে প্রধান কারণ মুসলমানদের দক্ষ নেতৃত্ব না থাকা।

জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

মৃত্যুপুরী গাযা; আমাদের করণীয়

■ বিন-ইয়ামিন সানিম

গাযা। ৪১ কিমি দীর্ঘ আর ১০ কিমি প্রশস্ত একটি শহর। এইটুকু জায়গার মধ্যে প্রায় ২৩ লাখ মানুষ গাদাগাদি করে বসবাস করে। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ একটা শহর বলা যায়। শহরটিতে বর্তমানে খাবার নেই। পানি নেই। বিদ্যুৎ নেই। গ্যাস নেই। জরুরি ওষুধপত্র নেই। নেই ইন্টারনেট সংযোগ। চলছে মুহুর্মুহু বিমানহামলা, রকেটহামলা। ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদরাসা, অ্যাম্বুলেন্স, এমনকি হাসপাতালও ইসরাইলি নরপিশাচ বাহিনীর বোমা হামলায় ধ্বস্তবিধ্বস্ত হচ্ছে। আবালবৃদ্ধবনিত কেউই রেহাই পাচ্ছে না এই অমানবিক গণহত্যা থেকে।

এ সবকিছুর মাধ্যে শাহাদাতের তামান্নায় অপেক্ষারত আমাদের লাখ লাখ মুসলিম ভাই ও বোন। তবুও নিজেদের ভিটেমাটি, পবিত্র ভূমি ছাড়তে নারাজ। ঈমানি চেতনা নিয়ে আল-আকসার সম্মান রক্ষার্থে মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস।

সর্বশেষ সংবাদমতে এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনি শহিদদের সংখ্যা ১১ হাজার ছাড়িয়েছে। এদের মধ্যে ৪০% হচ্ছে শিশু। জানি না, এই সংখ্যা কততে গিয়ে দাঁড়াবে। দুইশো কোটি মুসলমানের পৃথিবীতে মাত্র দেড় কোটি ইহুদির হাতে গাজার মুসলিমরা আজ নির্যাতিত-নিপীড়িত। বড় আফসোসের সাথে বলতে হয়, ইসরাইলি হামলায় তাদের মিত্র দেশগুলো ঠিকই সরেজমিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে 'আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদার' জ্বলন্ত প্রমাণ পেশ করেছে। কিন্তু পৃথিবীর এত বড় বড় মুসলিমপ্রধান দেশ, মুসলমানদের এত এত শক্তিধর সামরিক বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের কিন্তু ফিলিস্তিনের পাশে পাওয়া যাচ্ছে না। 'আল-মুসলিমু আখুল মুসলিম'-এর কোনো বাস্তব চিত্রই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দূর থেকে স্রেফ সমবেদনা আর হুংকার দিয়েই যেন তাদের দায়িত্ব খালাস। কিছুই যেন করার নেই আর! অথচ আমরা না-কি 'কাজাসাদিন ওয়াহিদিন', একদেহ-একপ্রাণ!

ফিলিস্তিনের এই করুণ সংকটময় মুহূর্তে আমরা যদিও সশরীরে তাদের জন্য কিছু করতে পারছি না। কিন্তু আমাদের করার আছে অনেক কিছু। প্রথমত আমরা বুক ভাসিয়ে আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য দোয়া করতে পারি। আর্থিক সহায়তা পাঠাতে পারি। তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে পারি। ইসরাইলকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত তাদের পণ্যাসব বয়কট করতে পারি। এসব কিছুর পাশাপাশি আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করতে পারি। আর তা হলো, ফিলিস্তিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি। আল আকসার স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনা উম্মাহর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারি।

সেই ধারাবাহিকতায় 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম'-এর মুখপত্র 'নবীনকণ্ঠ' এবার আয়োজন করেছে আল-কুদস সংখ্যা। আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহকে কবুল ফরমান। মাজলুমদের হেফাজত করেন। ফিলিস্তিনের বিজয় তরান্বিত করেন। আমিন ইয়া-রব।

নির্বাহী সম্পাদক, নবীনকণ্ঠ

মানুষ যখন মানুষের ব্যথা বোঝে, মানুষের বিপদে মানুষ যখন পাশে দাঁড়ায়, যখন মানুষ মানুষের জন্য হাসে এবং কাঁদে, আকাশের ফিরেশতারা তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। *(মাও. আবু তাহের মিছবাহ হা.)*

বি ধ্ব স্ত গা যা

ফারিহা জান্নাত

সেদিন হঠাৎ শুনেছিলাম আকাশের তর্জন, ভেবেছিলাম আকাশ মেঘ করে ডাকছে। এই বুঝি রহমতের ফোঁটায় বারিধারা প্লাবিত হবে। কিন্তু আমি তো জানি না রহমত আমাদের উপর কতটা নির্মিত! সেদিন গাযার মাটিতে ছিল ভয়াবহ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। কালো ধোঁয়ায় দূষিত ছিল রাজপথের অলিগলি। শিশু থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ সকল গাযাবাসীর কান্নার রোল পড়েছিল আকাশে বাতাসে। জমিনের বর্ণ ছিল লালিমায় রঞ্জিত। আজ গাযার আকাশে পাখির ডানা ঝাপটানো বন্ধ হয়ে গেছে। পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। রক্তিম আভার ন্যায় জমিন ধসে যাচ্ছে বোমার বিস্ফোরণে। শত থেকে হাজারে ছাড়িয়ে গেছে নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের প্রাণ। ছিন্নভিন্ন হয়েছে ফুলের মতো ফুটফুটে শিশুদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আজও থেমে নেই, আজও চালিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণ। তাদের বিস্ফোরণ গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ঈমানদারদের ঘরবাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ছে কতশত তাজা প্রাণ। নিষ্পাপ শিশুদের চাহনি। তাঁদের রক্তভেজা আকুতি; তবুও ছাড় পেলো না ইসরায়েলের অত্যাচারী জালিমদের জুলুম থেকে। বাবা থেকে সন্তানকে, সন্তান থেকে মাকে, স্বামী থেকে স্ত্রীকে, স্ত্রী থেকে স্বামীকে আলাদা করে দিচ্ছে। রেহাই দিচ্ছে না কাউকে, ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে। আহ! কত নির্মম গণহত্যা চালাচ্ছে তারা। জুলুমের শিকার হচ্ছে কতশত নিরীহ মুসলিম। ক্ষুধার যন্ত্রণা, পানির পিপাসা সাথে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হচ্ছে তাঁদের। কতই না ভয়াবহ দিন পার করছে তাঁরা। জালিমের জুলুম সহ্য করছে আর রাব্বে কারিমের ফরিয়াদ জানাচ্ছে...। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত আর তারাই যথার্থসফলকাম।' (সুরা বাকারা ২: ৫)

শিক্ষিকা ও লেখিকা

নিরাশ হয়ো না! চাওয়ার মতো যদি চাইতে পারো তাহলে তুমিও অনেক কিছু পেতে পারো। এ দুয়ার থেকে তো ডাক আসে দিন রাত, এসো হে নেককার, এসো হে গোনাহগার, লুটে নাও আমার দানের ভাণ্ডার। (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

জেগে ওঠো মুসলিম সেনানী

● তানবিরুল হক আবিদ

বেলা ফুরাবার আগে, গোধূলি সাজে আপন সাজে। দিবাকর অস্তাচলে। নিষ্প্রভ আলো নিয়ে কোনোমতে বেঁচে আছে। দিন রাতের পালাবদল, একটু পরেই যার দেখা মিলবে। মানুষ বড় স্বপ্নবিলাসী। বর্ণিল স্বপ্ন দেখে। লাখপতি থেকে কোটিপতি, চাকরিতে পদোন্নতি, ব্যবসায় দ্বিগুণ মুনাফা। ডাগর মেয়ের জন্যে মোটা বেতনে চাকরি করা সুপুরুষ জামাইসহ আরও কতকিছু। কিন্তু গাযার মজলুম জাতি স্বপ্ন দেখে ইসরাইলের থাবার নখর থেকে আল-কুদস রক্ষা করবে। নিজেদের ভূখণ্ড অধিকার ফিরে পেতে দখলদার ইহুদিদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। সময় বড় নিষ্ঠুর। আকাশ ছোঁয়া যুদ্ধের ডামাডোলে কেটে গেল দুটি সপ্তাহ। দিন দিন ইসরাইলি বর্বরতা বেড়ে চলেছে। পুরো গাযাজুড়ে থমথমে পরিবেশ। চারদিকে বারুদের গন্ধ। অনিশ্চয়তায় কাঁটছে প্রতিটি ক্ষণ। এইবুঝি আছড়ে পড়বে বিস্ফোরক। কেড়ে নেবে প্রাণ। গায়ের ওপর ধ্বসে পড়বে ভবন। মায়ের বুকফাটা আর্তনাদে কাঁপবে আকাশ বাতাস। চার বছরের জোবায়ের। রক্তে ভেজা জামা তার পরনে। উদভ্রান্তের মতো ধ্বংসস্তূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুঁজে চলেছে নিজ পরিবার। দুধের শিশু পড়ে আছে। ক্ষতবিক্ষত শরীর। ডান কপালে রক্তের চির ধরেছে। বাঁ পায়ের উপর একখণ্ড ভাঙা দেয়াল। চোখ দুটো বুজে আসছে তার। চাঁদের মতো ফুটফুটে চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। মুখ খুলে ঠোঁট নাড়িয়ে বলে চলেছে, মা কোথায় তুমি! আমি এখানে খোলা আকাশের নিচে। ছাতি শুকিয়ে গেছে আর কাঁদতে পারছি না। তোমার আঁচলেতুলে নাও, একটু দুধ দাও, আমি যে আর সইতে পারছি না।

কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেবার মতো কেউ নেই। দৃষ্টির সীমানা জুড়ে ধ্বংসের রাজ্য। বইয়ের গুদাম আগুনে পুড়ে গেলে যেমন কালো ছাই হয়ে যায়, কাঠি দিয়েখোঁচা দিলে দু-এক টুকরো কাগজের সন্ধান মেলে। গাযা উপত্যকার ভবনগুলোর অবস্থা অনেকটা তেমনই; ইসরাইলি বিমানহামলায় মাটির সাথে মিশে গেছে সবকিছু। খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে নরপিশাচের দল। পেট্রোল পাম্পগুলো খাঁখাঁ করছে। হাসপাতালে ফুরিয়ে আসছে চিকিৎসা সরঞ্জাম। ধুঁকে ধুঁকে মরছে মানুষ। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লাশের মিছিল। অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন কাটছে গাযাবাসীদের। চিকিৎসাযোগ্য নয়টি হাসপাতালের চারটিতে চালানো হয়েছে বিমানহামলা। হতাহত হয়েছে হাজার নারী-শিশু।সবকিছু ঘটে চলেছে চোখের সামনে। মুহুর্মুহু বোমার আঘাতে কাঁপছে মধ্যপ্রাচ্য। তিলে তিলে নিঃশেষ হচ্ছে মুসলিম জাতি। হামাস নিধনের নামে শুরু হয়েছে গণহত্যা। রাতের আঁধারে টনেটনে বোমা ফেলে পাখির মতো বেসামরিক জনগণকে হত্যা করছে ইসরাইলি বাহিনী। আল জাজিরার তথ্য অনুযায়ী যার সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে দশ হাজারের ওপরে। এদের অধিকাংশ শিশু।রেহাই পাচ্ছে না সাংবাদিক, বিদেশি নাগরিকও। এতকিছুর পরও মুসলিম বিশ্ব নেতাদের দেখা নেই। নেই কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ। লেবাননের হিজবুল্লাহ হামাসের পক্ষে সরব হলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে পায়নি কোনো সমর্থন। ইরানের হুমকি ও অস্ত্র সাহায্যের কথা শোনা গেলেও তাদের দেখা মেলেনি সরজমিনে। বিশ্ব মানবতা আজ কোথায়! কোথায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী। যখন বিশ্ব মোড়লরা ঘটা করে ইসরাইলের দল ভারী করছে–ড্রোন, যুদ্ধজাহাজ, ফাইটার বিমানসহ অত্যাধুনিক সব অস্ত্র-সৈন্য দিয়ে। তখন মুসলিম নেতাদের ভূয়সী সমবেদনা আর দফায় দফায় শান্তি বৈঠকের অর্থ কী হতে পারে। শুধু ট্রাক ট্রাক ত্রাণ আর ইসরাইলের কুৎসা গাইলেই কি রক্ষা পাবে পবিত্র ভূমি আল-কুদুস। কেন তাদের এই নীরব ভূমিকা। তারা কেনই বা পরোক্ষ প্রত্যক্ষভাবে সৈন্য অস্ত্র দিয়ে মজলুমদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। তবে কি আমরা বুঝে নেব তারাও পশ্চিমাদের দোসর, রাজনৈতিক চাপের মুখে বিপর্যস্ত। না-কি এ নীরবতার পেছনে রয়েছে না জানা কোনো রহস্য। এমন শত প্রশ্নের উত্তর আমাদের অজানা। সময়ই বলে দেবে সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সর্বোপরি ফিলিস্তিনি মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর সার্বিক প্রতিজ্ঞা।

শিক্ষার্থী, জামিয়াতুল ওস্তাদ শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী রহ. ওয়াসপুর, ঢাকা।

বৈদ্যুতিক আলোর ধাঁধায় ভুলে যেয়ো না, দূর অতীতে তোমার জীবনে ছিলো মোমের আলোর স্নিগ্ধতা। (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

মানবতার জয় হোক

ফিলিস্তিন স্বাধীন হোক

হুসাইন আহমদ

ইসলামে এমন কিছু বিষয় ও জিনিস আছে, যেগুলোর প্রতি ভালোবাসা রাখা ও যেগুলোকে ভালোবাসা ঈমানদারদের ঈমানি দায়িত্ব ও কর্তব্য। যেগুলোর প্রতি কেউ যদি অবহেলা করে ও হৃদয়ে ভালোবাসা লালন না করে, সেগুলোর অমর্যাদা হওয়ায় এবং অমুসলিমদের হাতে দখল হয়ে যাওয়ায় যদি হৃদয়ে রক্তক্ষরণ না হয়, কোনো দাগ না কাটে, তাহলে সে কখনোই পরিপূর্ণ মুমিনই হতে পারবে না। সে কখনোই নিজেকে পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসেবে দাবি করতে পারবে না। এমন বিষয় অনেকই রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, ইসলামের মৌলিক কোনো বিষয় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বা কোনো একজন মুসলিম অমুসলিমদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে, তাহলে মুসলমানদের উচিত এগিয়ে আসা। সহমর্মিতা প্রকাশ করা। তাদের সেই হক আদায় করে দেওয়া। এই যেমন বর্তমান ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় সাধারণ অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও নির্যাতিত মুসলমানরা যখন তাদের প্রাপ্য অধিকার ও পাওনাটুকু বুঝে নিতে চাচ্ছে, তখন তাদের ভেতরে একধরনের স্বাধিকারবোধের সৃষ্টি হচ্ছে। যে স্বাধিকারবোধের পূর্ণাঙ্গ রূপই হলো একটি জাতির স্বাধীনতা। আর স্বাধীনতা অর্জনে প্রতিটি দেশ ও জাতিরই ইতিহাস থাকে সহস্র বছর ধরে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জাজ্বল্যমান।

এই স্বাধীনতা হঠাৎ করে উদয় হওয়া কোনো বিষয় নয়, বরং প্রতিটি স্বাধীনতা অর্জনে রয়েছে বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাস। বহু সম্পদ ও প্রাণের বিসর্জনের রক্তমাখা ইতিহাস। তাই সময়ের প্রতিটি কার্যকর মুহূর্ত ধাপে ধাপে প্রতিটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় মুক্তিকামী মানুষের পদাঙ্ক অনুসরণে। চূড়ান্ত বিজয়ে। আজ আমাদের ফিলিস্তিনের ভাইদের সেই স্বাধিকার ও প্রয়োজন থেকেই তাদের চাওয়া-পাওয়া। আর এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিয়েছে বলেই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী মুসলমানরা তাদের অধিকারের প্রশ্নে সজাগ হয়ে উঠছে। জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে।

স্বাধীন ফিলিস্তিনের জন্য চলমান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। যুবক, বৃদ্ধ, কিশোর, নারী সবাই তাদের মুক্তি চাচ্ছে। জবরদখলকারী জালিমদের থেকে নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা কামনা করছে। গড়ে তুলছে সামর্থ্যের মধ্যে আন্দোলন। ফিলিস্তিনিজাতি বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন পতাকা উড়াতে চাচ্ছে। আর হ্যাঁ, স্বাধীনতা অর্থ নিজস্ব ভূমির মালিকানা উদ্ধার করা। দখলদার বাহিনীর হাত থেকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে মুক্ত করা। মুক্ত করে নিজ জাতির জন্য প্রাপ্য আলোটুকু নিশ্চিত করার মধ্যে স্বাধীনতার সাফল্য অর্জন করা। আর জাতি হিসেবে এটা তাদের কাম্যও বটে। এজন্য স্বাধীনতার মতো বৃহৎ বিষয়টি সম্মুখে আনতে হলে জাতি হিসাবে ফিলিস্তিনকে আরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পাশাপাশি আমাদেরকেও অত্যাচারিত এসব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করতে হবে। কেননা, ফিলিস্তিনিদের উপর অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতন দিনদিন ক্রমশ বেড়েই চলছে। প্রতিনিয়ত নারী তার প্রাপ্য স্বাধীনতাকে হারাচ্ছে। গরিব-অসহায়, অধিকার বঞ্চিত মানুষ তার স্বাধীনতা হারাচ্ছে। এখন তো ফিলিস্তিনের গাজাকে মৃত্যুপুরীতে পরিণতকরেছে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও সাধারণ ফিলিস্তিনিকে তারা মেরে ফেলেছে। হাজার হাজার মানুষ আহত হয়ে পড়ে রয়েছে। জীবন প্রবাহের সকল প্রকার মাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছে। আর উপর থেকে ভয়ংকর সব রকেট ও বোমা হামলা করে সব তছনছ করে দিচ্ছে। এটা কি ফিলিস্তিনিদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? আর তাদের কী স্বাধীনতা অর্জন করার অধিকার নেই। অবশ্যই আছে। আর হ্যাঁ, একজন সাধারণ সচেতন মুমিন হিসেবে বলব, ফিলিস্তিনিরাও একটি আশাবাদী, সংগ্রামী ও ঈমানদার জাতি; তারাও পথচলায় অবিচল, কর্মের মাধ্যমে একদিন তারাও তাদের স্বাধীনতাকে অর্জন করবে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আল্লাহর পবিত্র জমিনে বসবাস করবে, ইনশাআল্লাহ।

অতএব, একজন মুমিন হিসেবে ফিলিস্তিনের মাজলুম ভাইদের প্রতি ও আল- কুদসের প্রতি ভালোবাসা ও টান থাকাটা একান্তই জরুরি। আর এই ভালোবাসার দাবি হচ্ছে, তাদের এই স্বাধীনতার জন্য আমরা সবসময় তাদের পাশে থাকব। তাদের অধিকার আদায়ে আমরা সমর্থন করব। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব। তাদের অঙ্গীকার–বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অন্যান্য স্বাধীন দেশের মতো ফিলিস্তিনও থাকুক, সবার সাথে এটা আমরাও চাইব। আমরাও চাইব–শহিদের রক্ত ঝরানো ফিলিস্তিনের জেরুজালেম হোক ফিলিস্তিনের স্বাধীন রাজধানী। আর কোনো রক্তের দাগ না লাগুক মুমিনদের প্রিয় আল-কুদস চত্বরে। মুক্ত হোক আল-কুদস। বিজয় হোক মুমিন হৃদের ভালোবাসা আল-কুদসের। বিজয় হোক ফিলিস্তিনের।

শিক্ষক ও লেখক

মমতাময়ী মা

• ইলিয়াস মুহা. সোহাগ

সবসময় মাকে নিয়ে চিন্তা করতে, মায়ের স্নেহ-আঁচলের নিচে স্থান নিতে ভালো লাগে। দুহাত তুলে মায়ের জন্য দুআ করতে আর নামাজে মা-বাবার সাথে সদাচরণ এবং তাঁরা বৃদ্ধ হলে তাঁদের সাথে করণীয় সম্পর্কিত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেও পুলকিত হই খুব। মায়ের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখা এবং সার্বিক খোঁজখবর নেওয়ার মধ্যেই এক অমৃত স্বাদ অনুভূত হয় আমার। মায়ের চোখের আড়াল হলে আমার চেয়ে বেশি কষ্ট পান আমার গর্ভধারিণী মা। এইতো সেদিন জীবিকার তাগিদে কাপড়-চোপড়সহ ব্যাগ গুছিয়ে পাশের গ্রামে কর্মস্থলে চলে এলাম। দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে রাতে মাকে ফোন দিলাম কর্মস্থলে সহিহ সালামতে এসে পৌঁছার খবর জানাতে। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম ফোনের ওইপাশে মা কাঁদছেন আর নাক-চোখের পানি মুছতে মুছতে বলছেন, বাবা! বাড়িতে থাকাকালীন সারাক্ষণ মসজিদে থাকতি আর আসা-যাওয়ার সময় শরীরের হাল-হাকিকত, খাওয়া-দাওয়াসহ ঔষধপত্র সেবনের কথা জিগ্যেস করতি; এখন তো আর 'খেয়েছি কি-না, দোকান থেকে কিছু এনে দেবো কি-না, বাজারে যেতে হবে কি-না' বলে জিগ্যেস করবি না–এই ভেবে দুমড়ে মুচড়ে উঠছে আমার ভেতর। স্থীর হয়ে বসতে পারছি না কোথাও। একবার বাড়ির সামনে যাচ্ছি আরেকবার ঘরে আসছি। তোর জন্য হৃদয়টা ছটপট করছে বাবা। যেখানেই থাকিস, যেভাবেই থাকিস তোর জন্য সব সময় মন থেকে দুআ থাকবে আমার। কর্মস্থল খুব বেশি দূরে নয়। বর্ষার মৌসুমে আসা-যাওয়া কষ্টকর হলেও শুকনো মৌসুমে নদীর পাড় ঘেঁষে হেঁটে হেঁটে প্রতিদিন কমপক্ষে একবার হলেও বাড়িতে গিয়ে দেখে আসতে পারব মায়ের মমতামাখা মুখ এবং প্রিয় মানুষগুলোকে। এতটা কাছাকাছি থাকাসত্ত্বেও মায়ের আন্তরিক ভালোবাসায় মোড়ানোকথাগুলো শোনামাত্রই টপটপ করে চোখের অশ্রুতে দাড়ি ভিজে যাচ্ছিল আমার।কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না নিজেকে। পুরুষরা জাতিগতভাবেই একটু শক্ত স্বভাবের, তাই নিজেকে একটু শক্ত করে মাকে সান্ত্বনা দিলাম। ফোন রেে বালিশে মাথা গুঁজে ভাবতে ভাবতে গভীর ঘুমে ডুব দিলাম। ফজরের আজানেরমিষ্টি সুরে হুঁশ ফিরল আমার। –আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে; তাঁদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'বিরক্তিসূচক' কিছু (উফ/উহ) বলবে না এবং তাঁদের সাথে ধমকের গলায় কথা বলবে না; বরং তাঁদের সাথে সম্মানসূচক নম্র ভাষায় কথা বলবে। তাঁদের সামনে বিনয়ের সাথে নম্রভাবে মাথা নত করো এবং বলো হে আমার প্রভু! তাঁদের প্রতি রহম করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালনপালন করেছিলেন। (সুরা বনি-ইসরাঈল, আয়াত: ২৩,২৪)

অন্ধকার যখন ঘনীভূত হয় তখন বুঝতে হবে, নতুন ভোরের নতুন সূর্যোদয়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

দিন রাতের ঘূর্ণন

তাশরীফ আহমদ

দিন শেষে রাত আসে। রাত শেষে দিন। পুবের আকাশে উষা দিবসের চিন। ঠিক তা-ই। প্রতিদিন পূর্বের আকাশে যখন আস্তে আস্তে সূর্য মাথা তুলতে থাকে, ডিমের কুসুমের মতো লাল সূর্য খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে যখন চারদিক আলোকিত করতে থাকে, তখনই একটি দিনের সূচনা ঘটে। আমরা চারদিকের জনপদকে জাগতে দেখি। সবাই কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাখির কলকাকলির সাথে মানুষের কোলাহলও বাড়তে থাকে। এভাবে প্রতিদিন পৃথিবী জেগে ওঠে। জেগে উঠে এর বাসিন্দারা। তারপর কোলাহল আস্তে আস্তে থেমে যায়। সূর্যের লালিমা আবার পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায় দিবসের কর্মক্লান্ত সূর্য। আমাদের কর্মব্যস্ততা কমে আসে। পাখির নীড়ে ফেরার মতো আমরাও ঘরে ফিরি। সবশেষে ঢলে পড়ি ঘুমের কোলে। দিনের ক্লান্তিরা সব ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। প্রশান্তি আমাদের সঙ্গী হয়।

এভাবেই দিন রাতকে তাড়া করে আবার রাত যেন তাড়া করে বেড়ায় দিনকে। সাধারণ চোখে দিনরাতকে এরকমই মনে হয়। কিন্তু আমরা যদি একই সাথে সারাটা পৃথিবীকে দেখতে পেতাম, তাহলে রাতদিনের পার্থক্যটা বুঝতে পারতাম না। বাংলাদেশে যখন রাত, আমেরিকায় তখন দিন। আমরা যখন প্রবল ঘুমে অচেতন, তখন লন্ডন থেকে আমাদের কোনো আত্মীয় হয়তো ফোন করছে দিনের প্রচন্ড

ব্যস্ততার মধ্য থেকে। হ্যাঁ, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী তার আপন কক্ষপথে একবার ঘুরে আসছে। একই সাথে তা সূর্যের চারদিকেও ঘুরছে ধীরে ধীরে। পৃথিবীর যে অংশটুকু ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের মুখোমুখি হয়, সে অংশে দিন আর অপর অংশে তখন রাত হয়। রাত ও দিনের আবর্তনের মাঝে আমাদের আলাদা কিছু করণীয় আছে। মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আর তোমাদের জন্য রাতকে করেছি আচ্ছাদনকারী এবং দিনকে করেছি কর্মময়। প্রতিটি সভ্য মানুষই দিন ও রাতকে সেজন্য আলাদা সর্বোত্তম পন্থায় ব্যবহার করে। কী চমৎকার কথা বলেছেন, প্রতিদিন সূর্য ওঠার সাথে সাথে দুজন ফেরেশতা মানুষের কাছে বলেন, হে বনি আদম, আমি একটি নতুন দিন এবং আমি তোমার সকল কাজের সাক্ষী। সুতরাং আমাকে সর্বোত্তম পন্থায় ব্যবহার করো। শেষ বিচারের দিন না-আসা পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসবো না।

প্রিয় নবি আরও বলেছেন, ধ্বংস তার জন্য, যার আজকের দিনটি গতকাল থেকে উত্তম হলো না। পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি, এর যত কল্যাণময়তা সবকিছুই মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি ফেরেশতাগণ মানুষের খেদমতে নিয়োজিত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরি করেছেন। আর সকল সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন মানুষের অধীন করে। আর আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের শক্তি বিবেক, যার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দ বুঝতে পারে, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। সেই সাথে তিনি অন্য সৃষ্টির মতো মানুষকে শৃঙ্খলে বন্দি করেননি বরং দিয়েছেন ইচ্ছার স্বাধীনতা। সে ইচ্ছা করলে ভালোটা করতে পারে আবার মন্দ কাজেও জড়িয়ে যেতে পারে। সেজন্যই ভালো-মন্দের সত্যিকারের সিদ্ধান্তকারী মানুষ নিজে। সে চাইলে নিজের জীবনকে সর্বোত্তমভাবে সাজাতে পারে, আবার সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারে।

শিক্ষার্থী, জামি'আ ইসলামি'য়া দারুল ইন'আম

> সব মানুষ এক, আকার ও আকৃতিতে। পার্থক্য শুধু কর্মের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে এবং অনুভবের ক্ষেত্রে। (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

বিভীষিকাময় আর্তনাদ

তাওসীফ আহমাদ

সম্প্রতি খবরের মূল বিষয়–ইসরাইলি বাহিনী ফিলিস্তিনে হামলা চালিয়ে এতজন আহত, এতজন নিহত করেছে। আকাশের নীল আলোকচ্ছটা আঁধারে সমাগত হচ্ছে ফিলিস্তিনজুড়ে। হাহাকার আর্তনাদে নিরীহ ফিলিস্তিন আজ সঙ্গহীন পরিবার। স্বজন হারিয়ে বেদনার আহাজারি-নিঃশ্বাস নেওয়া প্রতিটি ফিলিস্তিনি সদস্যের। কালো ধোঁয়ায় ফিলিস্তিনিদের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। স্বপ্নগুলো চোখের সামনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো আর ফেরা হবে না, দেখা হবে না আল-আকসার সৌন্দর্য। যে আল-আকসায় এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামাজ আদায়ের সওয়াব পাওয়া যায়।

[১] সেখানে ঈদ উপলক্ষে শহিদ হওয়া নিষ্পাপ ছোট্ট ছোট্ট ফুলগুলোর হাসিমাখা আনন্দঘন মুহূর্ত আর কখনোই দেখতে পাবো না। যে আল-আকসা সম্পর্কে হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যে, 'যে-ব্যক্তি কেবল সালাতের উদ্দেশ্যেই আল-আকসায় উপস্থিত হবে, সে ওই দিনকার মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে, যেন তাঁর মা তাকে ওইদিন প্রসব করেছিল।'

[২] সে আল-আকাসায় সন্তানের প্রতি মা-বাবার স্বস্তির নিঃশ্বাসটুকু আর যোগ হবে না–তাঁদের জীবনজুড়ে। হারিয়ে গেল কতশত প্রাণ, যে প্রাণগুলোর

প্রণয়ী স্পন্দনে আল-আকসা ফুটে উঠতো। হৃদয়টা নির্বাক হয়ে আছে দুঃখের সঙ্গ মিলিয়ে। সইতে পারছি না। ছোট্ট ছোট্ট নিষ্পাপ শিশুদের রক্তমাখা শরীর আর দেখতে পারছি না। একটি মাথা দুই টুকরো, হাতের একাংশ নেই, অপর হাতে বাঁচার জন্য আকুতিভরা আর্তনাদ; মুখভরা রক্ত। ব্যথার যন্ত্রণায় শিশুগুলো বোধহয় মাকে একটিবারের জন্যে 'মা' বলে ডাকবারও সুযোগ পায়নি। কখনোবা বাবা-মা সন্তানের খোঁজে হাহাকার করছে, কখনোবা সন্তান বাবা-মার টুকরো টুকরো শহিদি শরীর খুঁজে পাওয়ার আর্তচিৎকার করছে। এত এত সমাধির সমাপ্তি–ফিলিস্তিন ও আল-আকসার বিজয় দিয়েই হবে ইনশাআল্লাহ, ওয়া ইনশাআল্লাহ।

[১] মুসনাদে আহমদ : ২৬৩৪৩
[২] ইবনে মাজাহ : ১৪০৮

অনুশীলন করো বেশী লিখে এবং পরিবেশন করো কম লিখে; তুমি হবে সফল লেখক। তোমার লেখা হবে হৃদয়স্পর্শী ও কালোত্তীর্ণ। (মাও. তাহের মিছবাহ হা.)

একটি ফুলের মৃত্যু

সাঈদ আশরাফ

একটি নরম-মসৃণ কোমল কণ্ঠ। পবিত্র একটি আত্মা। ফুটফুটে একটি ফুল। বাবার রাজকন্যা ছোট্ট ফারহা। ফোনের এপাশ থেকে বাবা বাবা বলে ডাকছে।

– বাবা, বাবা।

– জ্বি, আম্মু?

– কখন আসবে তুমি?

– এই তো আম্মু এখনি আসছি।

ছোট্ট ফারহা অপেক্ষা করছে বাবার জন্য। বাবা আসলে সে খেলবে। খেলার জন্য আলমারি থেকে বড়-বড় দুটো টেডিবিয়ার বের করে রেখেছে। বাবা আসার অপেক্ষায় বসে আছে ফুটফুটে এ ফুলটি।

জামাল একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে জব করে। সকাল নয়টায় অফিসে যায়, তো ফেরে সন্ধে ছয়টা কিংবা সাতটায়। মাঝে-মাঝে কাজের ব্যস্ততায় খানিক লেট হয়। তবে আজ সে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে বেলা ডোবার আগেই। দেশের অবস্থা বেশি ভালো না। অনির্দিষ্টকালের জন্য অফিস বন্ধের ঘোষণা এসেছে। রাস্তাঘাট এখন কারো জন্যেই তেমন নিরাপদ না। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রতিটি কদম ফেলতে হয়।

জামালের ছোট্ট পরিবার। পরিবারে সদস্য সংখ্যা তিনজন। জামাল, তার স্ত্রী ও ফারহা। ফারহার বয়স কেবল দু'বছর। মাত্র বাবা বলে ডাক ফুটেছে মুখে। অস্পষ্ট ডাক। যে ডাক শোনার জন্য জামালের কান খাঁড়া হয়ে থাকে সর্বক্ষণ। মন কেমন আনচান আনচান করে। মেয়ে ফারহার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। কাজে তেমন মন বসে না। ছুটি পেয়ে জামাল মনে মনে ভীষণ খুশিই হয়েছে। লম্বা একটা সময় ফারহার সাথে কাটানো যাবে। মেয়েকে দেখার জন্য তড়িঘড়ি করেই অফিস থেকে বের হলো জামাল।

রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। মোড়ে মোড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। যাকে ইচ্ছে ধরে নিচ্ছে কিংবা গুলি করে মেরে ফেলছে। তাদের কাছে এই মুহূর্তে প্রাণের মায়া বলে কিছু নেই। চতুর্দিকে গুলাগুলির আওয়াজ। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আসছে। এদিক-ওদিক থেকে শিশুদের কান্নার আওয়াজ আসছে। কিছুক্ষণ হলো ফারহাদের জানালায় একটি গুলি এসে জানালার কাচ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। গুলির আওয়াজে ছোট্ট ফারহা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। বাবা বাবা বলে আশ্রয় খুঁজতে থাকল। ততক্ষণে ফারহার মা শিরিন তাকে বুকে নিয়ে কান্না থামানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর চলছে। সবাইকে ঘরের ভেতরে অবস্থানের কথা বলা হচ্ছে। জামাল এসবকিছু দেখছে। চোখের কোণে অশ্রুরা ভিড় করছে। ফারহার জন্য চিন্তা হচ্ছে।

বাসার ফোনে বারবার ট্রাই করছে। ফোন যাচ্ছে না। নাম্বার বন্ধ জানাচ্ছে। জামালের চিন্তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ফারহার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে। কলিজাটার সাথে একবার কথা বলার জন্য বুকটা ছটফট করছে। বাবা বলে ডাক শুনতে ইচ্ছে করছে। জামাল পারছে না উড়ে চলে যেতে। দূরের কিছু এলাকায় মিসাইল-হামলা হলো। কালো মেঘের আবরণ ছেদ করে শোঁ শোঁ শব্দে শহরের বাসাগুলোতে আক্রমণ করা হয়। পরক্ষণেই কালো ধোঁয়ায় পুরো শহর অন্ধকার হয়ে

প্রতিটি আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে উঁচু উঁচু দালানকোঠা। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে শত শত পরিবার। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে দেহ। পুড়ে যাচ্ছে শরীর। ইট-পাথরের নিচে চাপা পড়ছে কতশত প্রাণ। জামালের চিন্তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সে ভয় পাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে ফারহাকে নিয়ে। আঁতকে উঠছে বারবার।

জামাল প্রায় বাসার কাছাকাছি। দূর থেকে বাসা দেখা যাচ্ছে। কলিজাটাকে এখান থেকেই ডাকতে ইচ্ছে করছে জামালের। পরক্ষণেই জামালের ফোন বেজে উঠলো। নাম্বার দেখে বুঝল ফারহা ফোন দিয়েছে। ফোন রিসিভ করতেই ওপাশ হতে ফারহার কণ্ঠ শোনা গেল। ফারহা কাঁদছে। কান্নার তীব্রতায় বাবা বলেও ডাকতে পারছে না। হয়তোবা বলতে চাচ্ছে্ড় বাবা তুমি কোথায়? আমি ভয় পাচ্ছি। গুলির আওয়াজ আমি নিতে পারছি না। বারুদের গন্ধ আমার সহ্য হচ্ছে না। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তুমি আমাকে নিয়ে যাও। আমাকে কোলে নাও। একটু ঘুম পাড়িয়ে দাও। মেয়ের কান্নায় জামালও কাঁদছে। একমাত্র কলিজাটার কান্নায় নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। বারবার বলছে, আম্মু, আমি এসে পড়েছি। তুমি কেঁদো না। আমি তোমার সাথে খেলব। তোমার টেডিবিয়ার দিয়ে আমরা ঘোড়া দৌড়াব। এগুলো বলতে বলতেই চোখের সামনে বাসাটা ধ্বসে পড়ল। মিসাইল আক্রমণ হয়েছে। সাথে সাথে হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গেল জামাল। কিছু বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে! তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার চোখের সামনে বাসাবাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

জামালের চোখের সামনে তার বাড়ি ভেঙে পড়ছে। কিন্তু ফারহার কী অবস্থা? প্রিয় অর্ধাঙ্গিনী কেমন আছে? দেরি হয়েছে দেখে আমার উপর সম্ভবত অভিমান করে আছে। আচ্ছা, ফারহা কেমন আছে? ফারহা কি ইট-পাথরের নিচে চাপা পড়েছে? হয়তোবা বাবা বলে চিৎকার করছে। জামাল দৌড়ে এলো বাসার কাছে। এতক্ষণে পুরো বাড়ি ভেঙে গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে গেছে। জামাল খুঁজছে ফারহাকে। কিন্তু ফারহা কোথায়? পাগলের মতো খুঁজতে থাকলো। অনেকক্ষণ খুঁজেও ফারহাকে পেল না। ওই তো দূরে দেখা যাচ্ছে ফারহার টেডিবিয়ার। জামাল দৌড়ে গেল। টেডিবিয়ার হাতে পেয়ে ফারহাকে খুঁজতে লাগল। ওই তো একটু সামনে ফারহার পরনের কাপড় পড়ে আছে। জামাল নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে মেয়ের একটি কাটা হাত পেল। অন্তরটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল জামালের। বুকটা যেন ছিঁড়ে গেল। আকাশটা যেন ভেঙে পড়ল মাথায়। আসমানের দিকে তাকিয়ে জোরে চিৎকার দিয়ে বলল–মারে, আমি এসে গেছি। তুই কোথায়? তোর বাবার সাথে খেলবি না? এই দেখ, তোর বাবার হাতে তোর পছন্দের টেডিবিয়ার। আয় বাবার সাথে খেলতে আয়। আয় মা বাবার সাথে খেলতে আয়...!

জামালের কান্নার আওয়াজ হয়তো কারো কানে পৌঁছায়নি। হয়তোবা তার মেয়ে ফারহার কাছেও না। নিমিষেই শেষ হয়ে গেল ফুটফুটে একটি জীবন। শেষ হয়ে গেল সাজানো জীবন আর সুখের সংসার। হারিয়ে ফেলল বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকুন। মেয়েকে হারিয়ে বাবা আজ নিঃস্ব। জামাল বসে আছে ধ্বসে পড়া ইটের স্তূপের উপর। পাশেই আগুনে জ্বলছে মেয়ের পছন্দের টেডিবিয়ার।

মনের যাতনা

এস. আজম রোকন

বৃষ্টি ভেজা ভোর। ঘুম ভাঙে সেই সকালে, তবুও উঠতে পারি না বিছানা ছেড়ে। মা কপালে হাত দিয়ে জ্বর মাপেন। একশো চার ডিগ্রি। চোখ মেলে তাকালাম; তুমি আসলে না। মাকে ডাক দিয়ে বলি-পানি! অনেক সময় গেলো, পানি এলো না। রুমের লাইট অন করে দেখি কেউ নেই। দেয়ালে লটকানো ছবির দিকে তাকালাম- মা তাঁর ডাগর চোখে তাকিয়ে আছেন। ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে আছে অজস্র স্বর্গীয় পরিদের সাথে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার নির্লিপ্ত হাসি।

দিন বাড়ে আমার জ্বরের প্রকোপও বাড়ে। বারোটা ছুঁতে অল্পক্ষণ বাকি। লাইফটাইম প্রেমিকার অল্পকিছু অভিমান ভাঙলো। আর একটু ভাঙলে হয়তো গরিবের দোরগোড়া মাড়াতে সক্ষম হতো। মোটা জঠর নেড়ে বোনের সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলেন টাকপড়া ডাক্তার মতিন। আমাকে দেখে তিনি নিত্যদিনের মতন মোলায়েম একটি হাসি দিলেন। তারপর লম্বা সময় ধরে নাড়িভুঁড়ি চেক করে তিনি জানালেন, বাঁচা মুশকিল।

আমি মতিন ডাক্তারের কথা শুনে যুদ্ধের ময়দানে ভারতীয় উপমহাদেশের কুখ্যাত রাজা দাহিরকে পরাজিত করার স্বাদ পাওয়ার মতন খুশি হলাম। হয়তো আমার বউ ছাবেকু এ খবরে বেজার হবে। মেয়েটি চাইছিল আমি বিছানাতে না মরি। আমি কোথায় মরলে সে খুশি হবে সেটা শতবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু কখনো বলেনি। আমার প্রশ্ন শুনলে শুধুই মুখটা কালো করে ফেলতো। আজও হয়তো এমন করবে।

ডাক্তার মতিন কিছু ওষুধপত্র লিখে দিয়ে খাওয়াতে বললেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মোলায়েম হাসিতে বললেন, টেনশন লইয়ো না। ভালা হইয়া যাইবা। আল্লা মানুষরে অসুখ দেয় আবার শেফাও দেয়।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পরও তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম অনেক্ষণ। লোকটারও বয়স হয়েছে অনেক। চোখে মোটা গ্লাসের চশমা লাগানো। ডান হাত দিয়ে বেতের যষ্টিতে ভর দিয়ে হাঁটেন। সত্যি আল্লাহ চান বলেই এখনো বেঁচে আছেন

আমি আপন মনে আবারও নিমগ্ন হলাম। দেয়ালে লটকানোআম্মার ছবিতে চোখ নিবদ্ধ করলাম।

আচ্ছা মরলে আমার লগে মা'র সাক্ষাৎ হইব? মনে মনে নিজের ভেতরকার লুকিয়ে থাকা নিজেকে জিগ্যেস করলাম। উত্তর এলো না। দুঃখ পেলাম। বুক ফেটে কান্না আসে কিন্তু পারি না। গরিবের চোখের জল নর্দমার জলের চাইতেও নোংরা; কারো কাজে আসে না।

মনে মনে হিসাবের খাতা নিয়ে হিসাব কষতে আরম্ভ করলাম-জীবনে কয়টা ভালো কাজ করছি। খুঁজে পাচ্ছি না। মরার বিছানাতে কে বা ভালো কাজের হিসাব মিলাতে পারে! আমার মাইয়াটা আগুনে পুড়ে মরল ওর উছিলায় কি আমায় মা'র লগে সাক্ষাৎ করাইব? কী জানি। সৃষ্টিকর্তার খেলা বোঝা মুশকিল।

হিসাব মিলে না আমার। সময় দীর্ঘ হচ্ছিল তবুও। ছাবেকু আল্লা গো বলে ডাক দিলো। তার ডাকে উঠানের মোরগ-মুরগিও ভয়ে কট-কটক কট-কটক করে ডাক ছাড়তে শুরু করল। ছাবেকুর কান্নার আওয়াজে আশেপাশের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। বাঁ-পাশে মুখ ফেরাতেই বাকি, উস্কখুস্ক চুলে দৌড়ে এসে আমার ওপর পড়লো সে। মনে মনে বললাম, অতঃপর মাড়াইল গরিবের দোরগোড়া। তার দিকে তাকালাম। ভারী সুন্দর লাগছে তাকে। সত্যি! মেয়ে মানুষ কাঁদলেও অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। আমার প্রেমিকা ছাবেকু। সুন্দরী ছাবেকু। আমার সন্তানের মা ছাবেকু। তার জন্যও আমার আগুনে পুড়ে মরে যাওয়া মাইয়াটা অপেক্ষা করছে। মধুর মিলনের অপেক্ষা।

আজ তার বিরহ বাড়ছে। আমার অনেকদিন আগে বাড়ছিল, যখন আমার মা আমারে জন্ম দিতে গিয়া মরছিল বৃষ্টির পানিতে ভিজে। যখন ঘরে আমার ঘুমন্ত বাপটারেও বোমা মেরে উড়ায়া দিছিল। আমার কি কমতেছে? জানি না। বিরহ কমে না। মরার পরেও কমে না। হয়তো জান্নাতে আমার প্রেমিকা ছাবেকুর অপেক্ষাতে বাড়বে আরো তীব্র হয়া।

> ঘরের সামান্য প্রদীপ যদি আলো দিতে পারে এবং পারে অন্ধকার দূর করতে, তাহলে জীবনের প্রদীপ কেন আলো দেবে না, কেন অন্ধকার দূর করবে না। (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

সাজানো স্বপ্নের ধ্বংসাত্মক সমাপ্তি

রাশেদ নাইব

আমি দেখেছি আমার মা-বাবা এক নিমিষেই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেছেন। আমার ভাই-বোনের লাশ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমার হাতের উপর যেন আমার ছোট বোনটা ভাইয়া ভাইয়া বলছে।

পরিবার নিয়ে বেশ আনন্দেই কাটছিল আমাদের সময়গুলো। তবে যখন থেকে ইহুদিরা আমাদের ভূখণ্ডে, আমাদের অনুগ্রহে থাকার সুযোগ পেয়েছে, তখন থেকেই একটা ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। তবুও আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা ক্রমান্বয়ে আমাদের আকসার দিকে নজর দিয়েছে, তখন থেকেই একটা বিরুদ্ধতার সূত্রপাত হয়েছে। সব মিলিয়ে ভালোই কাটছিল আমাদের সময়। মাঝেমধ্যে ইহুদিদের সাথে ঝামেলা হতো, তবুও আমরা মানিয়ে নিতে শিখে গেছি।

মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বেড়ে ওঠা আমি। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম, একদিন অনেক বড় হবো। নিজের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবতায় রূপ দেবো। নিজ গ্রাম ও দেশের মানুষের জন্য সামান্য হলেও কিছু করব।

পরিবার থেকেও সমর্থন পেতাম। পরিবারে চার ভাই-বোন আর মা-বাবা নিয়েই আমাদের বসবাস।

বাবা একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। আর ভাই-বোনদের মধ্যে (দুই ভাই, দুই বোন) আমিই সবার বড়। অনেক দায়িত্ব আমার সেটাও জানা আছে। বাবার পরেই পরিবারের দায়িত্ব আমার কাঁধে আসবে সেটাও বেশ ভালো করেই জানি। সেই সুবাদে নিজেকে ক্রমেই দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করছি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। কিছু বিষয় থাকে আমাদের চিন্তার বাইরে।

আমাদের বাড়িটা ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় অবস্থিত। আমরা অনেকবার আক্রমণের স্বীকার হয়েছি। তবে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে বেঁচে গেলাম। তবে সর্বদা যে নিরাপদ থাকব সেটাও নয়! আমাদের ভূখণ্ডে এসে, আমাদের অনুগ্রহে থেকে ইহুদিরা বেশ মজবুত হয়ে গেছে। তাদের এখন নিজস্ব ভূখণ্ড ইসরায়েল। বরাবরই তাদের সাথে আমাদের ঝামেলা লেগে থাকে। তারাও আক্রমণ করে আমরাও করি। আমাদের হামাস বাহিনীর আক্রমণে এবার তারা দিশেহারা হয়ে গেছে। কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না, কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না তারা। এর পরে পশ্চিমাদের সাপোর্ট নিয়ে, তাদের মোসাদ বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করে। এবার আমাদের পরিবার ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারেনি।

মোসাদের পৈশাচিকতা এতটাই প্রখর ছিল যে, আমার পরিবারসহ অনেক পরিবার ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার সাজানো স্বপ্নগুলোকে চোখের সামনেই পরাজয় বরণ করতে দেখছি। যেই সোনালি পরিবার আর গ্রাম নিয়ে হাজারো স্বপ্ন বুনেছি। ক্রমেই চোখের পলক পড়তেই, তাদের রক্তঝরা কান্না আমি দেখেছি। আমি দেখেছি আমার মা-বাবা এক নিমিষেই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেছেন। আমার ভাই-বোনের লাশ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমার হাতের উপর যেন আমার ছোট বোনটা ভাইয়া ভাইয়া বলছে। পরক্ষণেই নজর করলাম, আমাদের লুবাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে শাহাদাত বাক্য পাঠ করতে করতে চোখটা বন্ধ করে ফেলছে। আজ আমি বাকরুদ্ধ, আমার জবান থেকে কিছুই আসছে না।

আজ কোথায় আমার মুসলিম ভাই-বোনেরা। যারা ঈমানের বলে নিজেদেরকে বলিয়ান ভাবে। আমরাই তো সেই বীরের জাতি, যাদের ভয়ে জিহাদের ময়দানে কাফেরদের মস্তক অবনমিত হয়ে যেত। তবুও স্বপ্ন দেখি, আশা রাখি এই ভূখণ্ড আমাদের ছিল, আমাদের আছে এবং আমাদেরই থাকবে, ইনশাআল্লাহ। আমর া মুসলিম বীরের জাতি, আমরা কাপুরুষ নই। আমরাই ইসলামের বিজয়ী নিশান এই ভূখণ্ডে উড্ডীন করব, ইনশাআল্লাহ।

কবি ও লেখক

ক্ষতবিক্ষত স্বপ্ন

রশীদ আহমদ

নীরব নিস্তব্ধ রাত। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাতের খাবার খেয়ে বুকভরা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শয়নকক্ষে সবাই ঘুমের অপেক্ষায়। আবিদ তাকিয়ে আছে ঘড়ির কাটার দিকে, যেন তা থমকে দাঁড়িয়ে আছে। রাত পোহালেই ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট দেবে। এই রেজাল্টের উপর নির্ভর করে তার আল-আজহারে ভর্তি। আবিদের চোখেমুখে ঘুমের ছিটেফোঁটা নেই। ছটফট করে, এপাশ ওপাশ করে সময় কাটে। রাত যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

গাজার অন্যান্য বস্তির মতো আবিদের বস্তিতেও আছে মা-বাবা, ভাই-বোন। এখানেই আছে তার শৈশব ঘিরে কতশত স্মৃতি। এসব নিয়ে ভাবনায় ডুব দিলো আবিদ। হয়তো কয়েকদিনের ভেতর এ শৈশবমাখা প্রাচীর থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নেবে কোনো মহৎ অভীপ্সা। পাশের কক্ষে তাঁর মা-বাবা শুয়ে আছেন। তাঁরাও সন্তানের আগামীকালের ফলাফলের উপর ছক আঁকছেন। হঠাৎ মুহুর্মুহু শব্দে ভাবনায় ছেদ পড়ে। আচম্বিতে এমন বিকট আওয়াজে সবাই আঁতকে ওঠে। ভয়ে জড়সড়ো হয়ে যায়। একত্রে বসে সবাই তা নিয়ে আলোচনা করে। অবশ্য এমন ঘটনা গাজায় আজ নতুন নয়। তবুও যেন তাদের কাছে অবিশ্বাস্যই মনে হলো।

আলোচনা-পর্যালোচনার পরমুহূর্তেই তাদের ঘরের ছাদের উপর ইসরাইলি মিসাইল আঘাত হানে। মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বসতিঘর। সব আশা-আকাঙ্ক্ষা নিমিষেই মাটিতে দাফন হয়ে যায়। সাজানো স্বপ্নগুলো ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যায়। আবিদের ছিন্নভিন্ন দেহ খুঁজে পায় উদ্ধারকর্মীরা। তার পরিবারের সবাই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে জান্নাতের মেহমান হয়ে যায়। এভাবেই আবিদের সাজানো স্বপ্ন মাটিতে সমাহিত হয়। স্বপ্নের ছক আর বাস্তবতার মুখ দেখেনি। ইনশাআল্লাহ, জান্নাতে এরচেয়ে আরও ভালো স্বপ্ন বুনতে পারবে, বাস্তবতার মুখ দেখতে পাবে আবিদ। আর তাকে নিয়ে খেলা করবে হুর-পরিরা।

প্রযুক্তি দূরকে কাছে এনেছে সেই আনন্দে তুমি বিভোর, কখনো ভেবে দেখেছো, প্রযুক্তি কাছের কতকিছুকে নিয়ে গিয়েছে কত দূর! দোষ প্রযুক্তির নয় দোষ ...

জাগো মুসলিম জাগাও মানবতা

কাজী মারুফ

হে মুসলিম!
গভীর রাতে উত্তাল সমুদ্রের পরে
ঘন কালো মেঘের মতো, তোমার আকাশ-
দুর্যোগের তাণ্ডব নৃত্যে কম্পমান,
কুচক্রী শয়তানের বিষাক্ত ছোবলে নুয়ে পড়েছে উদ্দীপ্ত ঈমান,
ঈমানের শাখা প্রশাখা তাই নির্জীব ম্রিয়মাণ।

হে মুসলিম!
আমি জানি, ঘুণে খাওয়া কাঠের মতো
একেবারে অন্তঃসারশূন্য মিছমার-মগজ তোমার,
প্লেগাক্রান্ত ছুঁচোতে কলুষিত হৃদপ্রাঙ্গণ
এবং লাগামহীন মূর্খতার বাড়াবাড়ি তোমাতে প্রতিযোগিতার মতন।
নিঃশ্বাসের মতই নীরব নির্মমতার হাসিতে
দেখো সত্যের আলো ক্রমেই কেমন ক্ষয়িষ্ণু-ক্ষীয়মাণ।

হে মুসলিম!
এখনো ঘুমিয়ে আছ জানি,
ঘুমিয়েই থাকো,
গোটা দুনিয়া আনাচে-কানাচে সবখানে
মুসলিম ভাই বোনের আত্মচিৎকার আর
ছিন্নভিন্ন কলিজার দাগ যখন
ঘুম ভাঙাতে পারেনি তোমার, তবে ঘুমিয়েই থাকো।

হে জগৎস্রষ্টা
অনিরুদ্ধ,অনির্বাণ হতাশা ক্ষোভের
মুণ্ডু ছিঁড়তে ইচ্ছে হয় বড়,
ইচ্ছে হয়, ইন্দু সিন্ধু নীলিমা বিন্দুতে
ছুঁড়ে ফেলি তার মস্তকভূষণ, ঘৃণ্য বিভীষণ।
ব্যথা যন্ত্রণার বুক জুড়ে লেপ্টে থাকা
অনিশ্চিত-অনিশ্চয়তা, আর হাহাকারের তবু যদি হয়-
কিছুটা সঞ্চালন, সমুচ্ছেদ-মূলোৎপাটন,
সংনমন-সংবরণ।
তবু যদি ঘুম ভাঙে মুসলিম বীর সেনার,
ভেঙে চুরমার হয় যদি অত্যাচারীর হাতল-শিকল
যদি ফিরে আসে ফের মুসলিমের সুমহান
শাসন অবগাহন।

বিভাগীয় সম্পাদক, নবীনকণ্ঠ

আল-কুদুসের ভূমি

● সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

অনেক বেশি মনটা কাঁদে
ফিলিস্তিনের জন্য,
যুদ্ধে মরে হাজার মুমিন
করছে না কেউ গণ্য।

অনাহারে নারী-শিশু
জীবন নিয়ে ভয়,
ইসরায়েলি বোমাঘাতে
জীবন হারা হয়

তবুও তারা ঈমান নিয়ে
যুদ্ধে ঠিকই লড়ে,
দ্বীনকে বাঁচায় আগে তারা
জীবন বাঁচায় পরে।

দেয় না তারা কেড়ে নিতে
আল-কুদুসের ভূম,
এই ভূমিটা রাখতে ধরে
লড়ছে তারা ধুম।

রাখবো পূত

● শামসুল আরেফীন

প্রাণটা ভরে আল-আকসাকে
ভালোবাসি যারা,
নিঃসন্দেহে বলতে পারি
খাঁটি মুমিন তারা।

এই মাটিকে রাখব পূত
বুকের রক্ত দিয়ে,
জনে-জনে হও আগুয়ান
সবাই শপথ নিয়ে।

মারছে মানুষ ফিলিস্তিনে
ইহুদিদের দলে,
পিষ্ট হবে হায়েনাগুলো
মুমিন পায়ের তলে।

বিভাগীয় সম্পাদক, নবীনকণ্ঠ

চলো যাই যুদ্ধে
নাজমুল হক

ফিলিস্তিন আজ যাচ্ছে চলে
হায়েনাদের কাছে,
চলো মুমিন যুদ্ধে যাব
থাকব কেন পাছে।

আমার ভুবনজুড়ে আজি
আছে সবাই দুখে,
চারিপাশে মাতম চলে
নয়তো কেহ সুখে।

ইহুদিদের দাঁতের মাঝে
লেগে আছে রক্ত
যুদ্ধ করতে হবে এবার
আছি সবাই শক্ত।

আমার ফিলিস্তিন
মুহাম্মদ আলম জাহাঙ্গীর

ফিলিস্তিনি শিশু-কিশোর মা-বাবা আর বোনকে,
ইহুদিরা হত্যা করে যত ইচ্ছে জনকে।
গাজাবাসীর ঘরবাড়িতে ইহুদি সৈনিক,
বোমা মেরে ধ্বংস করে মুসলিমদেরকে দৈনিক।

গাজার ভূমি করছে দখল ইহুদি জোর করে,
চোখ রাঙিয়ে ওঠে তারা ফিলিস্তিনির ঘরে।
রক্ষা করতে আল-আকসা আর ফিলিস্তিনের ভূমি,
প্রতিবাদ প্রতিরোধ করো সবার আগে তুমি।

ওঠো ওঠো বিশ্ব মুসলিম ঘুম থেকে সব ওঠো,
আল-আকসাকে মুক্ত করতে ফিলিস্তিনে ছোটো।
বন্ধ করতে ভূমি দখল কান্না চিরদিন,
যুদ্ধ করে স্বাধীন করি আমরা ফিলিস্তিন।

ছড়া

বীর সেনানী
উম্মে আফিয়া

শুনছো নাকি তোমরা কভু
বীর সেনানীর বাণী,
কোথায় সে আজ বীরের জাতি
দূর করো সব গ্লানি।

ইহুদিদের রকেট বোমায়
জর্জরিত প্রাণ সব,
রেহাই পায়নি ছোট-বড়
ওগো আমার রব।

ওহে নবীন ওহে তরুণ
খোদার নামে দাও টান।
সময় এখন গর্জে ওঠার
বিলাতে তাজা প্রাণ।

গর্জে ওঠো
ইবনে আলাউদ্দিন

গর্জে উঠেছে ফিলিস্তিন
ঈমানি বল লয়ে,
পুণ্যভূমি করবে বিজয়
শত্রুরা তাই ভয়ে।

মরণকে নিজ সঙ্গী করে
রণাঙ্গনে তারা,
পণ করেছে শত্রুদের আজ
করবে ভূমি ছাড়া।

বীর সেনারা করছে লড়াই
মুখে তাকবির বলে,
ওই দেখা যায় হায়েনা সব
পিছু পিছু চলে।

গর্জে ওঠো মুসলিম যত
বাঁচাও আকসার-ই মান,
শত্রুদের করো কুপোকাত
উড়াও বিজয়-নিশান।

কালজয়ী সৈনিক

● উম্মে হানী সিফা

ফিলিস্তিনের বুকে ছড়িয়ে আছে দেখো
রক্তে মাখা কালজয়ী সৈনিক,
তেজোদীপ্ত অবয়ব দিয়ে গেছে সব
যতটায় বাড়ে যুদ্ধের রওনক।

তুমি ঘুমিয়ে আছ বিছানায় মরার
মতো আর পাঁচ যুবকের অবিকল,
তুমি কি ভুলতে বসেছ-কে ছিল সালাহউদ্দিন
কারা ছুটতো জিহাদে নিয়ে দলবল।

আর নয় জাগো! এবার খুলে দেখ চোখ,
কতটা ছড়িয়েছে তারা কতজন করেছে শহিদ।
কোষমুক্ত করে লও এবার, লও শান করে তরাবারি
তুমিই পারবে হতে খালিদ পারবে হতে সাঈদ।

নিনাদ শহর ফিলিস্তিন

● মুহা. আব্দুল্লাহ

আহার্য আজ বদহজমি করছে আহারকারীর,
টপটপাটপ ছুটছে গুলি ঝরছে শত শরীর।

অট্টালিকাও পাচ্ছে না ছাড় ভাঙছে শরীর গোশত ও হাড়,
কাতর নিনাদ এই শহরের নিত্য দিনের অস্থি ও ঘাড়।

রাশি রাশি রকেট বোমা ছুড়ছে জারজ ইহুদিরা,
শত শিশু নারী তাদের আক্রমণে দিশেহারা।

ত্রাণবাহী কার্গ গাড়ি আটকে আছে সারি সারি,
গাজায় মরছে ধুঁকে ধুঁকে অবুঝ শিশু নিঃস্ব নারী।

থরে থরে সাজানো আজ ইহুদিদের মরণাস্ত্র,
অসহায়দের রিক্ত করে ছিনিয়ে নেয় খাদ্য-বস্ত্র।

ক
বি
তা

বীরের কিবলা

মুহা. তাসনীম হোসেন

আকসা তুমি বীরের রক্ত
ঈমান দিয়ে হৃদয় সিক্ত,
জালিম শুধুই হয় তিক্ত
যুদ্ধে দেখ তোমার ভক্ত।

একটি শব্দ ঈমানদীপ্ত
কিবলা মোদের ফিলিস্তিন,
হাত বাড়িয়ে করবে কে গ্রাস
মারব তাদের গুটে আস্তিন।

চেতনা মোদের কিবলা তুমি
হাজার বীরের রক্তভূমি,
লড়াই করে মুক্তিকামী
কেমনে ফিরি এইতো আমি!

হাসবে আবার আকসা তুমি,
আজানের সুরে মোহিত ভূমি।

ফিলিস্তেনের যুদ্ধ

মুহাম্মদ মুকুল মিয়া

রাতে-দিনে হরদম
বুলেটের শব্দ,
ফাইটারের হুংকারে
হয়ে যায় জব্দ।

হা-হুতাশ আহাজারি
নেই কোনো খাদ্য,
লাশে-লাশে সয়লাব
রুখে কার সাধ্য!

মা নেই বাবা নেই
নেই কোনো সুখ,
অশ্রুতে জলে ভাসে
মানুষের বুক।

ভয়ানক যুদ্ধ
চাইনাকো আর,
সুখের সুবাতাস
আসুক আবার।

জ্বলসে গাযা

বাসুদেব সরকার

গাজার বুকে জ্বলছে আগুন
নির্বিচারে গুলি,
বোমায় দেহ ছিন্নভিন্ন
উড়ছে মাথার খুলি।

বাঁচার তরে চলছে লড়াই
আকসার পশ্চিম তীরে,
মাতৃভূমি করতে রক্ষা
হামাসের সব বীরে।

জেরুজালেম পবিত্র খুব
ফিলিস্তিনির কাছে,
নিজের দেশে পরবাসী
হয়ে তারা আছে।

পূর্বপুরুষ ছিলেন যাঁরা
তাঁদের ভিটেমাটি,
রক্ষা করতে চেষ্টা অধীর
মাতৃভূমিই খাঁটি।

শহিদি মরণ

জাহিদ হাসান

হে মুসলিম জেগে ওঠো
শাসন করো দ্বীন,
আসবে আবার ফিরে হাতে
মোদের ফিলিস্তিন।

দ্বীন কায়েমের জন্য যদি
দিতে হয় জীবন,
হাসিমুখে মেনে নেব
শহিদি মরণ।

চেয়ে দেখো ভাইয়ের সব
করছে লড়াই দ্বীনের,
তোমার আমার প্রাণের ভূমি
আল-কুদুস স্বাধীনের।

এবার যুদ্ধে মুক্ত করব
ফিলিস্তিনের মাটি,
আগাছাদের উপড়ে ফেলে
করব পরিপাটি।

কবিতা / ছড়া

ফিলিস্তিন শিশুর আর্তনাদ

মুহাম্মাদ আব্দুল হাকিম

যে শিশু পুতুল নিয়ে করবে খেলা,
সে শিশু জীবন নিয়ে লড়ছে সদা।

যে শিশু পিতা-মাতার কোল রাঙিয়ে আনন্দে রবে,
সে শিশু বোমাবর্ষণে বিল্ডিং চাপায় ধুঁকে মরে।

যে শিশু আপন নীড়ে রইবে সদা ঘর মাতিয়ে,
সে শিশু হাসপাতালে মরছে দেখো কাতর হয়ে।

গুমটি মেরে আছ বসে, দেখেও না-দেখার ভানে,
এভাবে রইবে কদিন হাত-পা গুটিয়ে এই ভুবনে।

আর্তনাদে করছে হাহাকার শিশুদের চিৎকারে,
কীভাবে দেখছ বসে, ফিলিস্তিনের দুঃখ দেখে।

বিশ্ব বিবেক বিভোর ঘুমে

মুহাম্মদ নূর ইসলাম

আকাশ থেকে বোমা ঝরে, জমিন থেকে গুলি,
ফিলিস্তিনে মুক্তিকামী মরছে মানুষগুলি।
মানুষ পোড়ার গন্ধে বাতাস হচ্ছে ভীষণ ভারী,
দাঁত কেলিয়ে হাসছে দেখ জালিম দখলদারি।

মারছে পুরুষ শিশু নারী, ভাঙছে শত বাড়ি,
শুনছে না কেউ ফিলিস্তিনির শোকের আহাজারি।
মোড়ল যারা দিচ্ছে তারা অপরাধকে সায়,
তাই বলে কি মার খাবে রোজ হয়ে নিরুপায়?

বিশ্ব বিবেক বিভোর ঘুমে জাতিসংঘের রুমে,
জাগাও তাকে ধমক দিয়ে, জাগবে না সে চুমে।
মানবতার বয়ান দিতে যারা আগুয়ান,
ফিলিস্তিনের বেলায় কেন তাদের পিছুটান?

দুইশো কোটি মুসলমানকে আশি লক্ষ ইহুদি,
পাখির মতো মারছে দেখে বলছো শুধু ছিঃ।

আকসা সবার আকসা আমার

রবিউল হাসান আরিফ

আর কতকাল সইব বলো জুলুম-অত্যাচার,
সময় এসেছে সোচ্চার হও ঘুরে দাড়াবার।
ওরে মুজাহিদ প্রতিবাদে লওরে হাতিয়ার,
আর কতদিন থাকবে বেহুঁশ, হওরে হুঁশিয়ার।
বজ্রকণ্ঠে স্লোগান তোলো আল্লাহু আকবার,
আল্লাহু আকবার বলো আল্লাহু আকবার।

মুসলিম উম্মাহর ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে দিতে হবে,
অধিকার আদায়ে নির্ভীক হয়ে সামনে এগোতে হবে।
মুক্ত করতে হবে এবার পবিত্র আকসাকে,
ইসরায়েলি দখলদারির বর্বরতা রুখতে।
ভয় করিনা বুলেট বোমা মামলা কিংবা হামলার,
ময়দানেতে ঝাঁপিয়ে পড় সাহায্য নিয়ে আল্লাহর।
আল্লাহু আকবার বলো আল্লাহু আকবার।

আকসা আমার আকসা তোমার, আকসা মুসলমানের।
ফিরিয়ে দিতে হবেই হবে দাবি আমাদের।
বীর খালিদের সৈন্যরা সব বীরের আওয়াজ তোলো।
তাই ঈমানি জোর কদমে দ্বীনের ঝান্ডা তোলো।

মাহদির সৈনিক

মুহাম্মাদ মাহদী হাসান

দেখ মাহদির সৈনিকেরা জেগে আজ,
রুখে দিতে জালিমের অনাচার দম্ভ-তাজ।
দখলদার ইসরাইল পার পাবেনা এবার,
খায়বরের হাতিয়ার তুলে নাও আবার।

ভেঙে ফেলো সব দুয়ার ভেঙে ফেলো সব বাধ,
ইহুদি-খ্রিষ্টান হবে হবেই বরবাদ।
দেখো আল-কুদুসের মিনার থেকে
আল্লাহু আকবার ধ্বনি শোনা যায়;
বিজয় হবে হবেই আমাদের
ওরা জ্বলে পুড়ে হবে ছাই।

ওদের থাকতে পারে পরাশক্তি
বুলেট কিংবা কামান,
আমাদের আছে ঈমানি শক্তি
ওরা হবে হবেই পরাজয়;
হামাস বাহিনীর বুকে নেই কোনো ভয়।
মোরা খোদার রাহে যুদ্ধ করি
খোদার রাহে ছুটে চলি;
মোরা সদা থাকি নির্ভয়
হবে হবেই মোদের বিজয়।

মোরা আল কুদুসের সুর-সৈনিক

আয়মান আরশাদ

আল কুদুস হতে আসছে ভেসে
জিহাদের ডাক।
ঈমানি চেতনায় তুমি জেগে উঠ
শীর উঁচু করে হও সজাগ।

ভয় নেই মোদের সাহস যোগায়
বিপ্লবী পাক কোরআন।
মোরা বিদ্রোহী বীর্ চিরদুর্দাম্
সুর-সৈনিক নিশাবসান।

মোরা বজ্র দুর্বাসা-বিশ্বমিত্র শিষ্য্
মোরা বিজয় করব মহাবিশ্ব
আল কুদুস লড়ায়ে লড়ব মোরা
ফের পরাভূত হবে নিঃশ্ব।

মোরা হুংকারে উঠি গর্জে,
মোরা মশগুল রণতূর্য্যে
মোরা হইনি কখনো লালসা মুখর-
শোষকের ঐষ্যর্য্যে!

আমরা হব আল কুদুস মিছিলের
প্রথম সিপাহসালার।
বিদ্রোহী হয়েই আমরা জন্ম নের্
মৃত্যু হবে মোদের যতবার।

আল-কুদস

তানভীর বিন ইসলাম

দিকে দিকে তোমার বিপদ,
যদি না আসো দ্বীনের পথে।
বল কত সময় পার হলে পরে,
জিহাদের পথে আসবে ফিরে।

তোমার বোনের বিষাদ কণ্ঠস্বর,
শিশুদের রক্তে রঞ্জিত ঐ প্রান্তর।
ধেয়ে আসছে আকসার পতন,
কেন ঘুমিয়ে কাটে তোমার জীবন।

এসো ভাই সেই পথে
রণাঙ্গনে আলোর মশাল হাতে,
খুন রাঙ্গা প্রান্তরে বিলাও প্রাণ
কুদসে ওড়াও ফের বিজয় নিশান।

ফিলিস্তিন ভ্রমণের স্বপ্ন

■ মঞ্জুরুল হক বাশার

মামার সাথে নিজেকে গাযায় আবিষ্কার করে চমকে উঠলাম। বর্তমানে নির্যাতিত-নিপীড়িত গাযাবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে সবাই অবগত। এতদাসত্ত্বেও মামা কীভাবে যেন আমাকে সাথে নিয়ে আসলেন এই পবিত্র ভূমিতে। আমি জানি না। মসজিদে আকসার পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি। ভাবতেই হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। অবশ্য পরিস্থিতির নাজুকতার দরুণ অভ্যন্তরে কিছুটা ভীতিও বিরাজ করছে। মামার সাথে এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরি করছি। মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, কীরকম যেন একটা গন্ধ আসছে না? মামা উত্তর দিলেন, গাযার মাটি থেকে তাজা রক্তের গন্ধ আসছে। আঁতকে উঠলাম। স্মার্টফোনে দেখা দৃশ্যগুলো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করব কখনো কল্পনাও করিনি। মামার সাথে সামনে অগ্রসর হলাম। চারিপাশে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, খোলা আকাশের নিচে রাত্রিযাপন, লাশ ও কবরের আধিক্য, হসপিটালের শয্যাশায়ী শিশুদের দেখে একটা বড় রকমের ধাক্কা খেলাম। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। আসলে মানুষের জীবনে যে কত অসহায়ত্ব থাকতে পারে, তা এসব হসপিটালে না গেলে বোঝা যাবে না। কী বীভৎস! কী ভয়ংকর!

হসপিটাল থেকে বের হয়ে একটু দূরে আসামাত্র বিকট আওয়াজে আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠলো। ভয় পেয়ে মামাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় অসাড় হয়ে গেলো আমার গোটা দেহ। হসপিটালের উপর একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। পুনরায় স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো শয্যাশায়ী শিশুদের রক্তমাখা দৃশ্য। ভাবনার চোরাবালিতে ডুবে উদ্ভ্রান্তের মতো হয়ে গেলাম। চিৎকার দিয়ে কান্না করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। চোখ খুলে নিজেকে নতুন একটা জায়গায় আবিষ্কার করলাম।

কিছুদিন পর... মামার সাথে হাঁটতে লাগলাম পবিত্র ভূমির সম্মুখভাগে। একটি শিশু গাছের ছায়ায় বসে অঝোরে কান্না করছে। মামা কিছুক্ষণ কথা বলে জানতে পারলেন, মেয়েটির নাম জান্নাত। তার পিতা-মাতা পিশাচদের আক্রমণে ইন্তেকাল করেছে। ভেতরটা কেমন দুমড়েমুচড়ে যাচ্ছিল। মামা বললেন,

এই হলো আমাদের আবেগের শহর। পবিত্র শহর ফিলিস্তিন। এখানে পিতা স্বীয় সন্তানকে কবরস্থ করে। সন্তানের সামনে নির্দোষ পিতাকে বন্দি করা হয়। নারীরা মানুষরূপী হায়েনাদের হিংস্র থাবায় আক্রান্ত হয়। চোখের সামনে প্রিয়জনদের শরীর ছিন্নভিন্ন হতে থাকে আধুনিক অস্ত্রের আক্রমণে। মামা রক্তচক্ষু নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন আর কাঁপছিলেন। হঠাৎ আমার শরীরে তীব্র উষ্ণতা অনুভব করলাম। রক্ত গরম হয়ে গেছে। তাঁদের জায়গায় নিজেকে রাখলাম। শিশুদের দৃশ্য আর মুসলিম ভাইদের অবস্থা নিজের ভেতর স্থাপন করলাম। আমি আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না। হাতে পাথর নিয়ে ক্রোধে দৌড়ে গেলাম মানুষরূপী নিকৃষ্ট প্রাণীদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। অল্প কিছুক্ষণ পর আমার বুক বিশালাকৃতির বুলেটে বৃদ্ধ হলো। মৃত্যুশয্যায় শায়িত আমি। মামা কোলের উপর আমার মাথা রেখে শিশুর মতো কান্না করছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হলো আমার একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। আমি তো জান্নাতের সুধা পানের অপেক্ষায় আছি।

ঘুমন্ত ছেলের মাথায় আদরের হাত স্পর্শ করলেন বাবা। কোমল কণ্ঠে ডাকতে লাগলেন–আবুল বাশার! আবুল বাশার! ওঠো বাবা! তাহাজ্জুদের সময় চলে গেলো। ঝটপট কাঁথা সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে হাঁপাচ্ছিলাম। একি! নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করলাম। তাহলে আমি কি এতক্ষণ স্বপ্নে ছিলাম! স্বপ্নের ঘোর এখনো পুরোপুরি কাটেনি। স্বপ্নের স্মৃতিচারণে হৃদয়-আকাশে মেঘের মতো ভেসে উঠলো নির্যাতনের নির্মম দৃশ্যগুলো। ঝটপট প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে মসজিদ পানে ছুটলাম। নামাজান্তে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানালাম। সর্বযুগেই আল্লাহ তাআলা মজলুমদের ফরিয়াদ কবুল করেছেন। অচিরেই ফিলিস্তিন বিজয় লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ।

জগন্নাথপুর, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ ।

পদ্মা সেতুর পথে

• এম এ রাজ্জাক

“স্বপ্নের পদ্মা সেতু কোটি মানুষের,
স্বপ্নের পদ্মা সেতু স্বাধীন বাংলাদেশের।
অনেক কষ্টের, অনেক যত্নের সেতু তুমি,
অনেক সাধনার, অনেক বাসনার ছবি তুমি।”

• ভ্রমণকাহিনি

উপরের অংশটুকু আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “অনুভবে ছোঁয়া” থেকে সংকলিত।

মাত্র কয়েক বছর আগের কল্পনাগুলো আজ বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। হ্যাঁ, বাংলাদেশের পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মিত হবে–এমন ভাবনা ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু বিশ্বকে তাক লাগিয়ে ২০২৩ সালে মুন্সিগঞ্জ-রাজবাড়ি জেলার মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে তা দৃশ্যমান হলো। কীভাবে এমন একটি দেশের পক্ষে সম্ভবপর হলো তা দেখতে আমার মতো সাধারণ একজন মানুষের উচ্ছ্বাসটা পরমভাবে দোলা দিতে লাগল। কখন দেখব, কীভাবে দেখব–এমন ব্যাকুলতা মনের কোণে বারবার তাড়া করতে শুরু করল।

অবশেষে কয়েকজন প্রিয় সহকর্মীকে নিয়ে ট্রেন যোগে এক দৌড় দিলাম। রাজশাহী টু ভাঙ্গা ২৩০ কিমি. পথ। জন-বারোর এক বহর নিয়ে ‘মধুমতি এক্সপ্রেস’ ট্রেন যোগে শুরু হলো ভ্রমণ। সকাল আটটায় রাজশাহীর এক নম্বর স্টেশনে ‘বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বি লাগাফুরুর রাহিম’ পাঠে কেবিনে উঠলাম। মুহূর্তেই দুপাশের অড়হর, কুশর, খেজুর, কলা ও নারকেলের সারি সারি গাছপালা ভেদ করে আড়ানী থেকে ইশ্বরদী পৌঁছলাম। জানি না ইশ্বরদীর মানুষের সর্দি লাগে কতটুকু; তবে প্রধানমন্ত্রীর গুচ্ছগ্রামের সাধারণ মানুষেরা কিন্তু এখানে খাঁটি সবজি, ঢেড়শ, লাল শাক, মুলা, গাজর ও ফুলকপির সুবাদে বেশ ঝরঝরে। ইশ্বরদীতে কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট ও কাগজের মিল দেশের বাড়তি সমৃদ্ধতার জানান দিচ্ছে। তারপর পাকশী স্টেশন। রাশিয়ার সহযোগিতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্রিটিশ আমলের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও লালন শাহ সেতু দর্শনে বুকটা ভরে গেলো। ইশ্বরদীর মধ্য দিয়ে গমনকালে দেখতে পেলাম দূরের মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে বাতাস, প্রমত্ত পদ্মার উথালপাথাল ঢেউ, ঢুলুঢুলু ট্রেনের গতিময়তা, দুপাড়ের শাদা শাদা কাশফুল, ইপিল ইপিল, মেহগনি, নিম, জাম ও ইউক্যালিপটাসের মন ভরানো সারি।

কুষ্টিয়ার পোড়াদহ জংশনে হালকা টি-ব্রেক হলো। ব্যস্ত ভিড়ের মধ্যে স্বল্পই সময়। সেখানকার নাজমুলের বিখ্যাত রং চা ক্লান্তিটা দূর করল অনেকখানি। এখান থেকে ভিন্ন লাইন। কুমার খালি হয়ে খোকশা। প্রচণ্ড গরমের সান্ত্বনা একমাত্র হাতপাখা। খানিকটা জিলাপি, খাস্তা আর প্যাঁচানো চানাচুরের বেজায় স্বাদ মুখে পুরে নিলাম।

ক্রমশ এক এক করে আঠারোটি স্টেশন পেরিয়ে দু'ধারের মাঠঘাট মাড়িয়ে বিকেল দুটোয় ভাঙ্গায় নিবদ্ধ হলো ট্রেনের ঘূর্ণায়মান চাকা। ভাঙ্গার দক্ষিণে ছোট্ট একটি বিল দেখতে পেলাম। অজ পাড়াগাঁর মতো চোখে পড়ল। বিলের পানকৌড়ি, হংস, বক, মাছরাঙা, গাঙচিল ও ডাহুকের সরব উপস্থিতি মনের পুলকিত রং বৃদ্ধি করল। তারপর অটোয় চেপে ফরিদপুর। ক্ষুধার্ত পেটে মাইকে হাঁকডাকওয়ালা দু'তলার এক হোটেলে উঠে ধড়ফড় দুপুরের খানায় শরিক হলাম। একচিলতে ইলিশ ও মিষ্টিকুমড়ার ঝোলের মধ্যে সাড়ে তিন শত টাকার মূল্য নির্ধারণ করল।

বাটপার কাকে বলে! এখানকার সবকিছুর দাম ঢাকার চেয়ে এক গুণ, আমাদের রাজশাহীর চেয়ে দ্বিগুণ। তারপর ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে বাসে উঠে মাওয়ার উদ্দেশ্যে এক দৌড়। প্রায় দশ কিলোমিটার পথের ভাড়া জনপ্রতি তিন শত। অনেক দরদামে দেড়শতে রাজি। এ যাত্রাটা আরও উপভোগ্য মনে হলো। প্রশস্ত রাস্তা, লেনের মধ্যে কাঠগোলাপ, মোরগ, বাহারি লাল-নীল-হলুদ-সবুজ কতশত ফুল! আহা, কী অপূর্ব! দু'ধারের সারি সারি সবুজায়ন দৃশ্যাবলী অসম্ভব চমৎকার। একটু পরেই শুনলাম উপরের আকাশ গুড়ুম গুড়ুম। দরদরে হঠাৎ বৃষ্টি। শান্ত মন। শাঁ শাঁ গতিতে ছুটে চলা বাসে মনে হলো অচেনা কোনো পাহাড়ের বুক চিরে আমরা চাঁদের দেশে যাচ্ছি। বাস থেকে নেমে অটোরিকশায় মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় পদার্পণ।

মাওয়া শুধু ইলিশেরই ঘাট, তবু সস্তা নয় এখানকার ইলিশ। লোকমুখে শোনা রোজ প্রত্যুষেই না-কি কোটি টাকার ইলিশ কেনাবেচা হয়। বিকেলের হালকা রোদ, মেঘলা আকাশ ও মৃদুমন্দ বাতাস আমাদের উৎসুক জনা কয়েক যাত্রীর ক্লান্তিটা ভুলিয়ে দিলো পদ্মার পশ্চিমা বাতাসের ঢেউ দোলা দিলো মনে। কয়েকটি সেলফি নিলাম। প্রিয় সঙ্গীর হালকা জলের ছিটা গায়ে শিহরণের ঢেউ জাগালো। ইচ্ছে জাগলো, নৌকায় ওপারের জাজিরায় যেতে। হঠাৎ বৃষ্টিতে আশা পণ্ড। মনে হলো ওপারে অজানা কেউ ফুলমালায় অভিষিক্ত করতে চাচ্ছে কিন্তু মুহূর্তের বৃষ্টিতেই যবনিকা হলো সে আশার। দু'চোখে পদ্মাসেতু দেখলাম আর অব্যক্ত মনের কোণে না বলা কথাগুলো জমা করে রাখলাম।

কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

জীবনের বহু সম্ভাবনার বিনাশ ঘটে এবং বহু প্রতিভার ঘটে অপমৃত্যু, শুধু চরিত্রের নীচতা, চিন্তার সঙ্কীর্ণতা এবং কথায় ও কাজে কপটতা ও উষ্ণতার কারণে। (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

দ্বীপের রাজা সেন্টমার্টিনে

রবিউল হাসান আরিফ

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে ক্লান্তি-গ্লানির অবসান ঘটাতে যখন বাড়ি ফিরি, তখনই ভ্রমণের বেশ ইচ্ছে জাগে। এবারও এর বিপরীত হয়নি। আমি আর আমার কতক সহপাঠীদের মন-মননে জেগে উঠলো প্রবল ইচ্ছে। দূরে কোথাও গিয়ে ভ্রমণের স্বপ্নিল ছবি আঁকতে। আগ্রহভরে আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। পরিশেষে নির্ধারিত হলো দূরের ওই বিশাল বঙ্গোপসাগরের বক্ষে অবস্থিত এক সুপরিচিত দ্বীপে যাওয়া যায়। লোকমুখে শোনা যায় এবং মানচিত্রের বুকেও দেখা মিলে তার নাম সেন্টমার্টিন। শুনেছি ওখানেও না-কি গড়ে উঠেছে বহু মানুষের বসতভিটা এবং সময়ে-সৃজনে হয় ভিনদেশীদের লোকারণ্য।

নিরূপণ করা হলো কোনো রোদেলা দিনকে, সেদিনই যাত্রা করবে সবে। খুশিতে যেমন আত্মহারা তেমনই আমার অন্তঃকরণে ভয়েরও কমতি নেই। আসলে তা হবারও কথা। কারণ, দূরের পথ, অচেনা জায়গা ও সামুদ্রিক ভ্রমণ। সবমিলিয়ে একটা ভয় কাজ করছিল।

মাগরিব ছুঁইছুঁই আমাদের যাত্রা শুরু হলো। কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল ইট-পাথর আর নানা রঙে রঙিন সাজানো-গোছানো এক দিলকশ মসজিদ। নামাজের সময় হওয়ায় সালাত সেরে ফের ছুটি গন্তব্যের দিকে। গাড়ি তার আপন গতিতে চলছে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি নিস্তব্ধ প্রাকৃতি। আঁধারের ঘনঘটা পর্যায়ক্রমে বেড়েই চলছে। প্রকৃতির সাথে আনমনে চলছে প্রেমের আলাপন। মন চায় এই ভাবনায় ডুবে থাকি। মহান রবের নিদারুণ সৃষ্টির অবলোকনে কখন যে চোখ লেগে হারিয়ে গেলাম জোছনা প্লাবিত স্বপ্নের জগতে, টেরই পেলাম না। হঠাৎ পাশের সিটের একজন বলল, উঠরে! আর ঘুমাসনা! চোখ মুছে দেখি আমরা টেকনাফের আঙিনায়। ইতিপূর্বে এখানে কখনো আসা হয়নি। ভালোই লাগছিল। ওখানকার এক সহপাঠীর বাসায় মেহমান হয়ে রাত্রি যাপন আর তাঁর অবিস্মরণীয় নিমন্ত্রণ আমাদের বেশ মুগ্ধ করল। অতঃপর সকাল-সকাল রওয়ানা সমুদ্রের কিনারে যাব বলে। অনেক ইচ্ছে নিয়ে ছুটছি। পরিচিত হবো অচেনা জায়গার সাথে। ভিন্নরকম প্রাকৃতিক ছোঁয়া পাবো। সাথে একঝাঁক তরুণ উদীয়মান আলেম। দেখতে পাই একের পর এক বিস্ময়কর দৃশ্য। যত দেখি ততই মুগ্ধ হই। সত্যিই মন ছুঁয়ে যায়। চারিদিকে উড়তে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈচিত্রময় পাখি। আমাদের পরিপার্শ্বিক সবাই দেখছে, খাদ্য দিচ্ছে আর খেলা করছে পাখিদের সঙ্গে। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি আর বিমোহিত হই। সাগরের স্রোত-ঢেউয়ের কলতান মন জুড়ানো এই দৃশ্যগুলো দেখে মনে পড়ে যায় কোরআনে করিমের সুরা লোকমানের ৩১ নং আয়াত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তোমরা কি এসব বুঝতে পারো না যে, মহান রবেরই অশেষ কৃপায় স্রোতঃস্বিনীতে নৌকা চলে, যেন তোমরা প্রভুর নিদর্শন দেখতে পাও"।

আহা কী অপরূপ রহস্যময় দ্বীপ! সবখানে বালি আর কত-শত পাথর। নানা জাতের সামুদ্রিক প্রাণী। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছি গাছ-বাঁশের তৈরিকৃত কী চমৎকার মানুষের বসতবাড়ি। লোনাজলের মিশ্রিত হিমেল বাতাস। সবমিলিয়ে এ এক অনন্য পরিবেশ। আনন্দ হিল্লোল ভ্রমণে প্রফুল্লতায় ভরে যায় আমাদের তনু-মন। মন চায় সেখানেই থেকে যাই। কিন্তু নিয়তি বড়ই নির্মম!

অতঃপর পবিত্র কোরআনের আয়াত পড়তে পড়তে ফিরি যে, ইরশাদে বারি তাআলা, "ভ্রমণ করো স্রষ্টার গড়া ভূখণ্ডে আর দেখো (অনুভব করো) আল্লাহর নিদর্শনসমূহ"। সুবহানাল্লাহ।

ভ্রমণকাহিনি

প্রভাতের আত্মকথন ...

• মাহবুবা সিদ্দিকা

ফজরের আজান, নামাজ ও ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস, সবার ভাগ্যে জোটে না। যার ভাগ্যে জোটে সে-ই প্রকৃত পরিচয়ে মুমিন। ফজরের নামাজ, অতঃপর জায়নামাজে বসে দৈনন্দিন কিছু আমল ও কুরআন তেলোয়াত-এগুলো যেন একজন মুমিন ও মুমিনার আত্মার খোরাক। আলোকময় উজ্জীবিত দীপ্তির প্রহরে ইশরাক নামাজ; এ-যেন নিজের জন্য আলো নিয়ে আসা। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের কত ধরনের নেয়ামত ও পরকালের সফলতার জন্য কত সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। মোনাজাত শেষ করে হিজাব খুলে ওড়না নিতেই দু'ভাই হাজির;

-আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।
-ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

কেমন আছো বলে দু'ভাই পাশে বসে গেলেন । মাথায় হাত বুলিয়ে দুআ করে দিলেন। আমি চোখ বন্ধ করে দুআগুলো গায়ে মেখে নিলাম আর আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানালাম। ভাইয়ের নেয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

কিছুক্ষণ পর ছোট-ভাইয়ের হাতে চায়ের পেয়ালা আর মেজো-ভাইয়ের হাতে পুষ্টিকর কিছু খাদ্য। পাঁচটা খেজুর, কিছু কাজুবাদাম, ছোলা ও গাজরসহ কিছু উপকরণ। আলহামদুলিল্লাহ। মন না চাইলেও খেতে হবে। কিছু করার নেই, ভাইদের আবদার। না খাওয়া পর্যন্ত আমার রুম থেকে যাবে না। যতটুকু খাওয়া যায় আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত। অবশেষে খাবার শেষ করে ভাইরা চলে গেলো। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের মতো দৈনিক সকালে আমার রুমেও খাবার নিয়ে যুদ্ধ চলে।

নীরব মনে বসে ভাবছি; কী করা যায়। কিছুদিন হলো কোনো কাজবাজ করছি না। অবসর সময়। খুব বোরিং ফিল করছি। টুকটাক কাজ করতে চাইলে মায়ের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ি। যাক হঠাৎ চোখ গেলো একট বইয়ের দিকে। নাম 'মেয়েদের সুন্দর জীবন'। তাহলে পড়া যাক। বইটি হাতে নিলাম। একাকিত্বে কোরআন ও বই আমার সঙ্গী হয়। বইটি পড়ছিলাম। হঠাৎ একটি লেখাতে চোখ আটকালো। খুব ভালো লেগেছে। বারবার পড়ছিলাম। বুঝছিলাম। খুবই জরুরি কথা।

তা হলো-'হে প্রিয় দুহিতারা! মুরুব্বিদের দেখে তাদের কাছ থেকে জ্ঞান-বুদ্ধি শিক্ষা করবে। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। লজ্জা-শরম ও আকল-বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে অলংকৃত করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জন করবে। সম্ভ্রম ও মর্যাদা সমুন্নত করে গর্বের সাথে জীবন-যাপন করবে। যতক্ষণ তোমাদের সামনে ভালো-মন্দের কিছু নমুনা পেশ না করা হবে, প্রাক্যুগীয় রীতি-নীতি ও শিক্ষা-দীক্ষার ত্রুটিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা না হবে এবং সমকালীন মেয়েদের চাল-চলন স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা না হবে, ততক্ষণ তোমরা বুঝতে সক্ষম হবে না এবং মনুষ্যত্বের পরশমণি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে পারবে না। তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো থেকে তোমরা মুক্ত হতে পারবে না।'

কত জ্ঞানগর্ব কথার ধার। মুগ্ধ হলাম। সংযত হলাম। চিন্তা করলাম নিজের জন্য। কোন-কোন অমূল্য রত্ন আমার মাঝে নেই-এ ব্যাপারে আমি কি অবগত আছি। কোন কোন আদর্শ গুণাবলি আমার থেকে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে এবং কোন কোন সৎ গুণাবলি থেকে আমি বঞ্চিত? জীবনের হিসেব কি মিলাচ্ছি? অতঃপর মায়ের ডাকে ভাবনার ছেদ ঘটলো। মা ডাক দিয়েছেন। কথা তো শুনতেই হবে। এক দৌড়ে মায়ের কাছে। মা আমার সবার সেরা। মা আমার বন্ধু। মা আমার কলিজার টুকরো। আল্লাহ তাআলা মাকে দীর্ঘ সুস্থ নেক হায়াত দান করুন। আমিন ইয়া-রব।

শিক্ষার্থী ও লেখিকা

> হে আদম সন্তান, তুমি তো কিছু দিবসের সমষ্টি, একটি দিবস যখন গত হল তো তোমার একাংশ নিঃশেষিত হল। —— হাসান বসরী রহ.

মা হারানো স্মৃতি

● আমেনা আক্তার

আমি তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। সামনেই ছিল জেএসসি পরীক্ষা। লক্ষ্য গোল্ডেন এ প্লাস। জানুয়ারি থেকেই অদম্য উদ্দীপনায় কঠোর পরিশ্রম শুরু করেছিলাম। মা ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। হাসপাতাল থেকে বাসা, বাসা থেকে হাসপাতাল এভাবেই চলছিল। আমি একবারও মাকে হাসপাতালে গিয়ে দেখতে পারিনি; কারণ মা ছিলেন ঢাকাতে আর আমি গ্রামে। সামনে বোর্ডপরীক্ষা, তাই প্রাইভেট ও স্কুল মিস করে মা আমাকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। আমার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারিনি। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেই মা গ্রামের বাড়িতে চলে আসতেন, সেই সময়টা ছিল আমার ভীষণ আনন্দের। মা অসুস্থ শরীর নিয়েও আমার যত্নের ত্রুটি করতেন না। পড়াশোনা করার সময় মা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে দিতেন। আমাকে ভালোবেসে মা বাতাস করে দিচ্ছে, তাই আমি অনেক আনন্দিত হতাম। তবে মায়ের কষ্ট হচ্ছে ভেবে নিষেধ করতাম। মা শুধু বলতেন, তোকে এ প্লাস পেতে হবে, ডাক্তার হতে হবে। মায়ের অনুপ্রেরণা আমাকে মানসিকভাবে আরও দৃঢ় করতো। ৪ই নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হলো। মা তখন গ্রামেই ছিলেন। পরীক্ষা ভালো হচ্ছিল। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে মা অসুস্থ শরীর নিয়েও আমাকে ভাত খাইয়ে দিতেন। যে স্মৃতিগুলো আজও অশ্রুসিক্ত নয়নে আমি স্মরণ করি। ১৮ই নভেম্বর পরীক্ষা শেষ হলো। মায়ের শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অবনতি হচ্ছিল। ২০শে নভেম্বর রাত থেকে মায়ের অবস্থা গুরুতর হতে লাগল। শেষরাতে মা আমার কথাই বারবার বলছিলেন কিন্তু আমি অন্য রুমে ঘুমাচ্ছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে মায়ের কথা আর শুনলাম না। মা অচেতন ছিলেন। অ্যাম্বুলেন্স না পাওয়ায় প্রাইভেট কার আনা হলো মাকে ঢাকায় নেওয়ার জন্য। এবার আমিও আছি মায়ের সাথে। কারণ, আমার আর প্যারা নাই, পরীক্ষা শেষ। কিন্তু গাড়িতে উঠানোর সাথে সাথেই মা ইহজগৎ ত্যাগ করলেন। হৃদয় বিদীর্ণকারী দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়লো আমার উপর। গোল্ডেন এ প্লাস তো আমি পেলাম কিন্তু মা জানতেই পারলেন না। শুধু জেএসসি কেন, এসএসসি এইসএসসিতেও জিপিএ ফাইভ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। কিন্তু মাকে ছাড়া এসব সফলতা আমার কাছে মূল্যহীন। একটা পবিত্র আত্মা নিয়ে জান্নাতে মায়ের সাথে সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় রইলাম।

মতলব, চাঁদপুর

> তুমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকো, সকলের কাম্য হয়ে থেকো। শত্রুও যেনো তোমাকে কামনা করে। (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

নিস্তব্ধ রজনী

● তাওহিদ ইসলাম

সময়ের হিসেবে রাতটা গভীর। একটা বাজবে প্রায়। চাঁদ দেখা হয়নি আজ। দেখা হয়নি বিকেলটাও। বিকেলটা কেটেছে নৈঃশব্দ্যে। আনমনে। ঘরে বসে। বই পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ে বিকেল পেরুলো। সূর্য হারালো তার নিজস্ব সক্ষমতা। আমার কল্পরাজ্যের দৃষ্টির সীমানা জুড়ে ভাসমান–গত হওয়া বিকেলের অদৃশ্য নীরবতা। আনন্দে গোলাপ হয়ে কিবা বিষাদের নীলে। দুঃখদের কান্না কিবা গোধূলির মুগ্ধতায়। শেষ বিকেলের স্মৃতিটা অতটা মনে নেই। কুয়াশার মতো ঝাপসা ঝাপসা। ভোরে কুড়িয়া আনা শিউলির সতেজতা হারানোর মতো। হঠাৎ! আনমনে। আমার রাতের সাথে সখ্য হলো। তার দুঃখহীনতার কথা জানালো। আমি অবাক হলাম! আমার দুঃখগুলো তার কাছে। তার গভীরতার কাছে বেঁচে দিলাম। সব। একজীবনের সকল পাওয়া। ভালোলাগা। দুনিয়ার জন্য কাউকে ভালোবেসে থাকলে। সে গল্পটাও। বিনিময়ে পেলাম অনেক কিছু। এই শহরে যা বিক্রি হয় না। হাজার কোটি টাকার চুক্তি কিবা বিনিময়ে যা পাওয়া দুষ্কর। যেমন: নীরবতা। একটু প্রশান্তি। কোলাহল থেকে মুক্তি। অশান্ত শহরের মনোরম নিস্তব্ধতা। ঘন কুটকুটে, সারা শব্দহীন। নিথর, কালো আঁধার। এ প্রাপ্তি! আমার অনেক কিছু। অনেক বলতে ভীষণ অনেক। যেটা তুলনাহীন। এই আঁধার আমাকে ভোরের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। সুবহে সাদিকে রবের সাথে সখ্য গড়ার সহযোগী হয়। আমি রবের কাছে মাথা নত করি। না পাওয়াগুলো চেয়ে নিই। ইচ্ছেদের পূর্ণতার দরখাস্ত পেশ করি। নিজেকে হারাই তখন। তাঁর দেওয়া ব্যক্তিত্বসহ আমার যা আছে। তাঁর কাছে সপে দিই। সব। বিনিময়ে চাওয়া থাকে তাঁর পবিত্র গোলামির অধিকার। তাঁকে ভালোবাসার একটুখানি দুঃসাহস। শত চাওয়া পাওয়ার গল্পে। একটি সময় পর নোনাজলের উপস্থিতি টের পাই। আমার তখন মনে পড়ে। দুগ্ধপোষ্য শিশুটির চিৎকার। মুসলিম ভাইদের আর্তনাদ। আমার প্রথম কিবলা। আল আকসাকে ছিনিয়ে নেওয়ার কথা। বেদনায় নীল হই তখন। নির্লজ্জ,পশ্চাত, দয়াহীন ইয়াহুদিদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমি নালিশ করি। রবের কাছে। না বলতে পারা অনেককিছুই আপন রবকে বলে ফেলি। নির্দিধায়।

ময়মনসিংহ

যদি ফল খেতে চাও! তাহলে বীজ লাগাও; চারাগাছে পানি দাও; দিনরাত গাছের যত্ন নাও। (আবু তাহের মিছবাহ হা.)

নবীনকণ্ঠ নিয়ে আপনাদের অনুভূতি

তারুণ্যের অনুপ্রেরণায় নবীনকণ্ঠ

● **মুহা. সায়েম আহমাদ**

তারুণ্য হচ্ছে একটি দেশের জন্য এগিয়ে যাওয়ার বড় শক্তি। এই তারুণ্যের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধিশীল করা সম্ভব। তারুণ্যের বিভিন্ন প্রতিভা-বলে এই সমাজ আলোকিত হবে, দূরীভূত হবে সমাজের নানানমুখি সমস্যা। তারুণ্যের প্রতিভা বিকশিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে নবীনকণ্ঠ। নবীনকণ্ঠ এমন একটি প্লাটফর্ম, যেখানে তারুণ্যের সৃজনশীল চর্চা কিংবা তাদের ইতিবাচক মনোবলকে মূল্যায়ন করাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই প্রাধান্যের জন্য তারুণ্য বা তরুণ প্রজন্ম আজ আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের আদর্শ সৈনিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যেখানে আজ তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে, তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার বিপরীতে ধ্বংস করছে। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। তাই তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান থাকবে, নিজেকে সবসময় ইতিবাচক কাজে লিপ্ত রাখুন। গড়ে তুলুন আগামীর জন্য। বেঁচে থাকুন ইতিবাচক সমাজে, এগিয়ে আসুন ইতিবাচক সমাজ বিনির্মাণে। আপনাদের ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে পাশে থাকবে নবীনকণ্ঠ। নবীনকণ্ঠ আপনাদেরকে অনুপ্রেরণার মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। নবীনকণ্ঠ ম্যাগাজিনের আগামীর পথচলা আরও বেশি সমৃদ্ধ হবে এবং তারুণ্যের জয়গান গেয়ে সফলতার শীর্ষে উজ্জীবিত হবে বলে বিশ্বাস রাখি।

কলামিস্ট ও সংগঠক

এগিয়ে যাও হে নবীনকণ্ঠ

● **আনিসুর রহমান আফিফি**

হক কিংবা বাতিল, পৃথিবীতে আজ অবধি যত বড়-বড় আন্দোলন হয়েছে, যত বড়-বড় পরিবর্তন এনেছে; তার পেছনে কংক্রিটের মতো যে শক্তি কাজ করেছে, সেটা হলো যুবশক্তি। অর্থাৎ, তরুণের তারুণ্যে ঘেরা অপ্রতিরোধ্য অদম্য শক্তি। তাইতো একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য যে, যদি কিছু করতে চাও তবে যুবশক্তিকে সামনের সারিতে রাখো। আজকাল যেখানে দেশ-বিদেশ কিংবা আন্তর্জাতিক মহলের নীতিনির্ধারকেরা যুবকদের বিপথগামী করছে। যে যুগের সন্ধিক্ষণে বাতিল সবল, হক দুর্বল; এহেন পরিস্থিতিতে যুবকদের মাঝে সুস্থধারার শুদ্ধ চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া একদল যুবকের নিরলস পরিশ্রমের ফল এই 'নবীনকণ্ঠ'।

তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা সুনিপুণ হাতের পরিচালনা আমার হৃদয় আক্ষরিক অর্থেই আপ্লুত করেছে। মনের অবকুণ্ঠে ভেসে আসছে–

"এগিয়ে যাও হে নবীনকণ্ঠ! চেয়ে আছি তোমার পথ,
দেখিয়ে দাও তোমার আলোয় সহজ-সরল পথ।"

মহান আল্লাহ 'নবীনকণ্ঠ'-কে ভরপুর কবুল করেন–এই প্রত্যাশা। আমিন।

উদ্যোক্তা ও লেখক

অনুভূতি

এ ধারা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকুক

● মুহাম্মদ হাসনাইন

সোশ্যাল মিডিয়ার এ যুগে তরুণ প্রতিভাবান হাজারো মুক্তা ঝরে যাচ্ছে। আধুনিক সিস্টেমের কারণে; অথচ আমরা সবাই জানি, এসব সিস্টেম অস্থায়ী। সেই পুরোনো ধারাই জারি থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত আর পুরোনো ধারা জারি রাখতে একদল তরুণ ভাইদের উদ্যোগে, 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম'র মুখপত্র 'নবীনকণ্ঠ' গঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তাঁদের এবারের আয়োজন আল-কুদস সংখ্যা। আশা করি, নবীনদের এ সংখ্যা অনেক ভালোকিছু হবে। সামনে নবীনদের জন্য আরও চমৎকার আয়োজন থাকবে, ইনশাআল্লাহ। এটাই প্রত্যাশা। আমরা নবীনরা তাঁদের এ আয়োজনকে সাপোর্ট এবং সমর্থন জানিয়ে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম, সৌদি আরব

নবীনকণ্ঠ নবীনদের সাহসী কণ্ঠ হবে

● আব্দুর রশীদ

অসংখ্য তরুণ একটি গাইডলাইন কিংবা সঠিক পথপ্রদর্শকের অভাবজনিত কারণে বিফলের জোয়ারে হারিয়ে যায়। ভেসে যায় তরুণদের প্রভাবশালী প্রতিভা। নিস্তব্ধ হয়ে যায় তরুণদের সাহসীকণ্ঠ। তাই, ছিটকে পড়া তরুণদের প্রতিভা বিকাশে এবং সৎ লেখক ও সাহসী কলম উপহার দিতে 'নবীনকণ্ঠ' ম্যাগাজিন নামে একটি ইউনিক প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম'। 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম'-এ সংযুক্ত প্রত্যেক তরুণ ফিরে পেয়েছে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের একটি অনন্য মাধ্যম। যার উদাহরণ কেবল অধম আমিই যথেষ্ট। যে প্ল্যাটফর্মের উৎসাহ আর সঠিক গাইডলাইনের ফলে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, আলহামদুল্লিাহ। তাই, প্রত্যেক তরুণদের প্রতিভা বিকাশে 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম' কর্তৃক আয়োজিত এই 'নবীনকণ্ঠ' ম্যাগাজিন অনেক বড় ভূমিকা পালন করবে বলে আশা রাখছি। 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম' এবং 'নবীনকণ্ঠ' ম্যাগাজিনের জন্য রইল আন্তরিক দুআ ও ভালোবাসা।

প্রাবন্ধিক ও গবেষক

আঁধার ঘেরা সমাজের আলোর মশাল হবে নবীনকণ্ঠ

মুফতী সাইফুল্লাহ বিন কাসিম

আধুনিক সভ্যতার এ যুগে পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে মুসলিম উম্মাহ আজ নির্যাতিত, নিপীড়িত। পুরো অমুসলিম জাতি মুসলিম সভ্যতার টুঁটি চেপে ধরতে চায়। ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায় মুসলিম উম্মাহর জাগরণকে। তারা হয়তো জানে না যে, এই মিশনে কখনো তারা সফলতার মুখ দেখবে না। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন; 'সত্য সমাগত, মিথ্যাঅপসৃত। আর মিথ্যা অপসৃত হবেই। (ইসরা : ৮১)

মহান আল্লাহ যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর পথ ও প্রদর্শক হিসেবে অসংখ্য দাঈ তৈরি করেছেন। যারা মুসলিম উম্মাহকে আঁধার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবে; দেখাবে সত্য ও ন্যায়ের পথ। তারই ধারাবাহিকতায় ১০-৭-২০২০ খ্রি. তারিখে একঝাঁক তরুণ আলেম ও গবেষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম'। যা দীর্ঘ এই তিন বছরে নতুন লিখিয়েদের আস্থার ঠিকানায় পরিণত হয়েছে।

আমার এবং আমার মতো এই গ্রুপের সকল সদস্যের অনেক দিনের তামান্না ছিল–যদি প্রাণের এই গ্রুপ থেকে কোনো ম্যাগাজিন বা পত্রিকা বের হতো! আলহামদুলিল্লাহ! বিলম্বে হলেও আজ সে তামান্না পূর্ণ হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'নবীনকণ্ঠ'র এবারের আল-কুদস সংখ্যা। বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম ও নবীনকণ্ঠ আঁধার ঘেরা সমাজে আলোর মশাল হয়ে, সত্য ও ন্যায়ের ধারক-বাহক হয়ে এগিয়ে যাক অনেক দূর– এই কামনাই করি মহান রবের কাছে।

মুহাদ্দিস, গবেষক ও লেখক

অনুভূতি

তারুণ্যের চেতনা হবে নবীনকণ্ঠ

● **জুবায়ের আহমেদ**

তরুণ প্রজন্ম আজ বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সরলপথ থেকে। জড়িয়ে পড়ছে মাদক, অশ্লীলতা আর স্মার্টফোনের নেশায়। সেখান থেকে তরুণরা যেন আবারও ফিরে পায় চিরচেনা শান্তির পথ, সরলপথ ও মুক্তির পথ—সেই লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম'র মুখপত্র 'নবীনকণ্ঠ'র চমৎকার আয়োজন। প্রতিভাবান একঝাঁক তরুণদের নিয়ে গঠিত 'নবীনকণ্ঠ' এবারের আয়োজন আল-কুদস সংখ্যা। তারুণ্য আজ জেগে উঠুক, আলোকিত হোক ওহির আলোয়। অনেক বেশি দোয়া ও শুভকামনা রইল 'নবীনকণ্ঠ'র জন্য।

লেখক

নবীনকণ্ঠ তরুণদের প্রতিভা শাণিত করবে

● **মাও. হাবিব উল্লাহ**

আধুনিকতার ছোঁয়ায় গা ভাসিয়ে অনেক তরুণ প্রতিভাবান ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যখন নিজেদের প্রতিভা হারাতে বসেছে, নিজেদের প্রতিভা কাজে লাগাতে পারছে না। তখন সেসব তরুণকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে, তাদের প্রতিভা শাণিত করে মেধা বিকাশের মাধ্যমে নিজে ও সমাজকে উপকৃত করার লক্ষ্যে; 'নবীনকণ্ঠ' নামে একটি ম্যাগাজিন বের করার উদ্যোগ নিয়েছে 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম'। তাদের এই মহৎ আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই। তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি। ভালোবাসার বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম ও নবীনকণ্ঠ অনেকদূর এগিয়ে যাক এটাই প্রত্যাশা। অতিদ্রুত সবার হাতে-হাতে ছড়িয়ে পড়ুক এটাই কামনা।

শিক্ষক ও সমাজসেবক

যুবকদের পথপ্রদর্শক হবে নবীনকণ্ঠ

● **জাবের মাহমুদ**

আলহামদুলিল্লাহ, আমি অত্যন্ত আনন্দ ও মুগ্ধ হয়েছি একঝাঁক তরুণ সাহসী ভাইদের সাহসিকতা ও তাদের কর্মপন্থা দেখে। এই ঘুণে ধরা সমাজকে পুনরায় উজ্জীবিত ও নীতি-নৈতিকতার ধাঁচে সাজিয়ে তোলার জন্য এই নবীন ভাইয়েরা মাসিক ম্যাগাজিন চালু করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এটা আসলেই আমাদের জন্য অনেক বড় সুসংবাদই বটে।

আশা করি, মাসিক এই ম্যাগাজিন 'নবীনকণ্ঠ' দেশ ও জাতি, বিশেষ করে দ্বীন ইসলামের শাশ্বত বাণী মানুষের ধারে-ধারে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ। এবং আমাদের অধঃপতিত সমাজের তরুণদের জন্য 'বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম'র আইডল হিসেবে সুপরিচিত ও তাদের পথপ্রদর্শক হবে।

ধর্মীয় শিক্ষক

নবীনকণ্ঠ পরিবার

মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের
শিক্ষক, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ,সাভার, ঢাকা

আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী
খতিব ও কলামিস্ট

মুফতী ইমদাদুল্লাহ
খতিব ও অনুবাদক

মুফতী সাইফুল্লাহ বিন কাসিম
শিক্ষক, চরশুভী মাদ্রাসা, ভোলা ।

আনিসুর রহমান আফিফি
উদ্যোক্তা ও লেখক

রাশেদ নাইব
কবি ও লেখক

মাও. হাবীব উল্লাহ
পরিচালক, তিজারাহ আসলী

মুহা. সায়েম আহমাদ
কলামিস্ট ও সংগঠক

উসমান বিন আব্দুল আলিম
সম্পাদক, নবীনকণ্ঠ

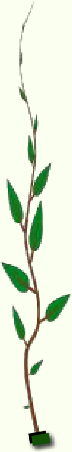

বিন-ইয়মিন সানিম
শিক্ষক ও প্রুফরিডার

মুহা. আব্দুর রশীদ
প্রাবন্ধিক ও গবেষক

শেখ মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ
সম্পাদক, ফিলহাল প্রকাশনী

ওলিউল্লাহ তাহসিন
শিক্ষক, মারকাযুসসুন্নাহ,উত্তরা,ঢাকা

জাবের মাহমুদ
শিক্ষক

শামসুল আরেফীন
ছড়াকার

হুসাইন আহমদ
শিক্ষক ও লেখক

তাশরীফ আহমদ
লেখক

তাওসীফ আহমাদ
শিক্ষক ও লেখক

আলাদা আলাদা আমরা এক বিন্দু,কিন্তু একত্রে আমরা এক সাগর।
ঐক্যের প্রধান হাতিয়ার; আমানতদার,নম্রতা ও বিশ্বস্ততা।

আস্থা ও বিশ্বাসের প্লাটফর্ম

তিজারাহ আসলী

(বাদাম,অরিজিনাল মধু,পারফিউম,ঘি,থ্রিপিস ও শাড়ি ইত্যাদি)

প্রোপাইটার :
মাওলানা হাবিব উল্লাহ
ইমেইল : md.habibullah8264@gmail.com
নাম্বার : ০১৮৬৬৯৫৬৭৯১

বি. দ্র.
বাংলাদেশের যেকোন জেলা ও থানা থেকে কুরিয়ারে অর্ডার নেয়া হয় ।
লক্ষীপুর ও ঢাকা জেলায় হোম ডেলিভারি দেয়া হয় ।

TIJARAH ASLI
তিজারাহ আসলী

সৌজন্য

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. প্রকাশনী

(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল; nobinkanthobnlf@gmail.com
যোগাযোগ; 01789204674